প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান

সুধাংশু পাত্র



বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশক
উৎপল হালদার
বাণীশিল্প
১১৩ ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
প্রশান্তকুমার বসু
ডি পি. প্রিন্টার্স
৫২/১, শিকদার বাগান স্ট্রীট,
কলকাতা-৪

পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের কয়েকটি অসাধারণ উপহার

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

ভারতের বিজ্ঞান সাধক (১ম খণ্ড)

ভারতের বিজ্ঞান সাধক (২য় খণ্ড)

ভূমিকা

প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি শাখায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। সে পরিচয় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে বেদপুরাণের কাহিনীগুলিতে। কাহিনীগুলির মধ্যে যেমন কিছু ব্যক্তি অসম্ভব ও অবাস্তবতার গন্ধ পান, অপর দিকে কিছু ভারতীয় মনে করেন বর্তমান কালের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি পুরাকালে ভারতের অজানা ছিল না। কেউ কেউ আরও মন্তব্য করেন, বিদেশীরা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। উপরোক্ত মন্তব্যগুলির কোনটিই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল সেগুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। তারপর বহুকাল ধরে বহু লোকের অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তির ফলে আসল কাঠামোটাই কবে হারিয়ে গেছে। মূল তত্ত্ব জানার আজ আর কোনো উপায় নেই। তাই যাঁরা অবাস্তবতার অভিযোগ আনয়ন করেন তাঁরা বড় একটা ভুল করেন না। আর যাঁরা কেবল প্রশংসার বাণীই উচ্চারণ করেন তাঁরাও একদেশদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। আমরা জানি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলি এক-আধ দিন কিংবা এক-আধ বছরের প্রচেষ্টায় সফল হয়নি। তার পশ্চাতে আছে শত শত বিজ্ঞানীর বহু বছরের অতন্দ্র সাধনা। উন্নত বিজ্ঞানচিন্তা সংস্কারে রূপান্তরিত হল কিংবা গল্পকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল। আর সংস্কারমুক্ত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে দখল করল শ্রেষ্ঠ আসন।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কিছুটা জাগরণ এসেছে ভারতে ঠিকই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সমতালে পা ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ ভারত বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ আজও সৃষ্টি করতে পারেনি। আজও দেখি, দিকে দিকে সেই অন্ধ কুসংস্কার আর আত্মতৃপ্তির ভাব। আত্মশুদ্ধি এখনও হল না আমাদের। আত্মশুদ্ধি না হলে আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও হয় না। তার উপর আমরা নিজেদের জন্য যত চিন্তা করি জাতির জন্য তার শতাংশের একাংশও করি না। সুখের কথা, বিজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জাতির নবজাগরণের সূচনা হয়েছে।

জাতির জাগরণের দিনে তাকে স্মরণ করতে হয় তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে। নিজেকে চিনতে হয় ভালভাবে। ভারতের অমূল্য রত্ন তার প্রাচীন গ্রন্থরাজি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি যার যেমন প্রয়োজন সবটুকুই লাভ করতে পারে, যদি সে প্রাচীন পুঁথিপত্রের শরণাপন্ন হয়। অনেক কিছু হারিয়ে গেছে, তবুও যেটুকু টিকে আছে তাও বড় কম নয়। বহু দেশী ও বিদেশী গবেষক ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছেন বহু মণিমুক্তা এবং এখনও তাঁদের সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য সমুদয় প্রচারিত হয়েছে বহু পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। কিন্তু সব আলোচনা একত্রভাবে কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বর্তমান পুস্তকে তারই ক্ষীণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। পুস্তক রচনার কৃতিত্ব আমার সামান্যই। গবেষকদের গবেষণা, বহু মহান পুস্তক ও পত্রিকার লিপি, পুরাণের গল্প অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার করতে হয়েছে। যে সব মহান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের শরণ নিয়েছি তাঁদের ঋণ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি। তাঁদের সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের নাম পুস্তকের মধ্যে উল্লেখ করে ঋণ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।

পুস্তকটি প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন আমারই এক আচার্যদেব শ্রীযুত হৃষিকেশ দাশ কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী মহাশয়। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি তিনি আগাগোড়া পাঠ করে ভ্রম সংশোধন করেছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে তাঁরই দেওয়া।

পুস্তকটি প্রণয়নে সাহায্য ও প্রকাশনায় প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাণীশিল্পের কর্তৃপক্ষ নবীন প্রকাশকবৃন্দ। তাঁদের উৎসাহ ভিন্ন এ লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়ত সম্ভব হত না। সেজন্য তাঁদের নিকট আমার ঋণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি।

পরিশেষে পুস্তকটির মুদ্রণকাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

যদি কোন সহৃদয় পাঠক বইটির মধ্যে কোন প্রকার তথ্যমূলক ভুল পান, দয়া করে সেগুলো জানালে উপকৃত হব।

সুধাংশু পাত্র

সূচীপত্র

---

*—৭৬ পৃষ্ঠায় ভুলবশতঃ হেডিং-এ 'গ্রহণ গণনার' পরিবর্তে 'রাশিচক্র গণনা' ছাপা হয়েছে। ওটা 'গ্রহণ গণনা' হবে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

পৃথিবীর আদিকথা

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রহস্যময় ধরণীর পানে। মনে ছিল হাজার প্রশ্ন। কে সে? এলই বা কোথা থেকে? এই পৃথিবীর পরিচয়টাই বা কী?

আপন বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেনি সেদিন। তাইতো পরমপিতা পরমেশ্বরের কাছে করুণভাবে আবেদন জানিয়েছিল—

ভগবন্ কিং প্রকারা ভূঃ কিমাকারা কিমাশ্রয়া।
কিং বিভাগা কথং চাত্র সপ্ত-পাতাল-ভূময়ঃ ॥

"হে ভগবন্! এই পৃথিবীটা কেমন? কেমন এর আকার? কাকেই বা (সে) আশ্রয় করে আছে? সপ্ত পাতাল-ভূমিই বা কোথায়?"

পৃথিবীকে জানার জন্য আজও মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। এখনও তার মনে সেই এক প্রশ্ন—কী করে জন্ম নিয়েছিল এই পৃথিবী? কেমন করে তার বুকে এসেছে জীব-জন্তু-মানুষ গাছপালা? এর শ্যামল অরণ্যানী, সীমাহীন অনন্ত মহাকাশ, সমুদ্রের অসীম জলরাশি, আজও মানুষের চিন্তার কারণ। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর রহস্যের জাল অনেকটা উন্মোচিত। আদিম পৃথিবীর কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন—আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন কিন্তু কোথাও ছিল না মহাসমুদ্রের গভীরতা। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তখন পূর্ণ ছিল গলিত তরল পদার্থে। উপরিভাগ ঠাণ্ডা পেয়ে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হল, কোথাও কঠিন শিলাস্তর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, কোথাও ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে এল অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ। সেগুলো আবার পৃথিবীর বাহিরে এসে শীতল হতে হতে একদিন পরিণত হল কঠিন আগ্নেয় শিলায়। সে শিলাও অবিকৃত থাকল না। হাজার হাজার বছরের সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত তাকে করল চূর্ণ বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা আবার নদী ও সমুদ্রস্রোতে বাহিত হয়ে স্তরে স্তরে জমা হল নদী-সাগরের বুকে। উৎপন্ন হল হরেক রকমের শিলা এবং মাটি। বিজ্ঞানীদের ধারণা এইভাবে মাটি সৃষ্টি হতে পৃথিবীর লেগেছিল লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি

বছর। তারপর একদিন শুভক্ষণে সাগরের জলে সৃষ্টি হল জলজ শৈবাল ও জলজ কীট। সেদিন অতি অল্প ভূ-ভাগ ছাড়া পৃথিবীর সমুদয় অংশ ছিল জলমগ্ন—যদিও সে জল ছিল না আজকের মত এত লবণাক্ত।

এই মত আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের। কিন্তু সুদূর অতীতে প্রায় সবগুলো সভ্যদেশই পৃথিবীর সেই অন্ধকার যুগটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল আদিতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। হয়ত কারণ ঠিক ঠিক অনুমান করতে পারেনি তারা। তাই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল এক একটি কল্পিত কাহিনীর মাধ্যমে। সেই সব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় কাহিনীটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানসম্মত সেই কাহিনীটি দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

আদিতে প্রলয় সমুদ্রের মাঝখানে অনন্ত শয্যায় শয়ান ছিলেন ভগবান বিষ্ণু। যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন তিনি—সৃষ্টির চিন্তায় বিভোর। এক সময় তাঁর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন হল দুই ভয়ঙ্কর দানব, মধু ও কৈটভ তাদের নাম। জন্ম মাত্র ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করল তারা। কখনও লাফ দিয়ে উঠে যায় আকাশে, আবার পাক খেতে খেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের জলে। তাদের গগনভেদী তীব্র চিৎকারে কেঁপে উঠে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। বিরক্ত হলেন বিষ্ণু। তথাপি শান্ত গলায় আহ্বান করলেন কাছে। বললেনঃ হে মধু ও কৈটভ! তোমাদের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে আমি মনঃস্থির করতে পারছি না। বারবার নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তোমরা আমার চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে এই মুহূর্তে সাগরের তলদেশে চলে যাও এবং খেলা কর।

বিষ্ণুর আদেশ শুনে খুশি হতে পারল না দানবদ্বয়। তবুও নতমস্তকে চলে গেল তারা। কিন্তু সদাচঞ্চল মধু ও কৈটভ সাগরতলে স্থির হয়ে খেলা করতে পারল না, জুড়ে দিল দেবী মহামায়ার আরাধনা। কেটে গেল হাজার হাজার বছর। অনাহারে অনিদ্রায় তাদের পর্বতপ্রমাণ শরীরগুলো শুকিয়ে একগাছা রুজ্জুর মত হয়ে গেল, তবুও তপস্যা থেকে বিরত হল না। আরও কেটে গেল কত বছর। তাদের প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনে দেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন আকাশবাণী করলেনঃ হে মধু ও কৈটভ! তোমাদের তপস্যায় আমি পরম প্রীতি লাভ করেছি। বল, কী বর তোমরা চাও? ভক্তিভরে প্রণাম জানাল মধু ও কৈটভ। সমস্বরে বলে উঠলঃ হে করুণাময়ী!

যদি একান্তই আমাদের প্রতি প্রসন্না হয়ে থাকেন, তাহলে এই বর দিন—যাতে নিজ ইচ্ছামত মৃত্যুকে বরণ করতে পারি আমরা।

পুনরায় আকাশবাণী হল ঃ তথাস্তু !

অন্তর্হিতা হলেন দেবী মহামায়া। মধু ও কৈটভ হৃষ্ট মনে সাগরতলে খেলা করতে লাগল।

দিন যায়। জলমগ্ন পৃথিবীর উপরিভাগে ভেসে থাকে অনন্তশয্যা, যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ভগবান্ বিষ্ণুকে কোলে নিয়ে। আর সাগরতলে খেলা করে সেই দুই শক্তিশালী মহাদানব মধু ও কৈটভ। হাজার বছর পরে একদিন সবিস্ময়ে দেখল তারা বিষ্ণুর নাভিদেশে শোভা পাচ্ছে পরম কমনীয় এক পদ্ম-পুষ্প। মধু ও কৈটভ ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কাছে। একদৃষ্টিতে তাকাল সেই অপূর্ব পদ্মটির দিকে। আবার এক বিস্ময় ফুটে উঠল তাদের চোখে। পদ্মটির পাপড়ির মধ্যে বসে আছেন দীপ্তিমান এক পুরুষ। তাঁর চারটে মাথা, চোখগুলি অর্ধনিমীলিত, দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে প্রচণ্ড দ্যুতি অথচ গভীর ধ্যানে মগ্ন। দানবমনের বিস্ময় এক সময় কৌতূহলে পরিণত হল। মাথায় ভর করল দুষ্টবুদ্ধি। দিব্যকান্তি সেই চতুর্মুখ পুরুষকে এবার তারা ভয় দেখাতে আরম্ভ করল। প্রথমে ছাড়ল প্রচণ্ড হুঙ্কার। সেই হুঙ্কার শুনে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হল না, কিন্তু তাঁর নাভিকমলস্থিত চতুর্মুখ পুরুষের ধ্যানভঙ্গ হল। ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে বুঝতে পেরেই অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ করে, বিকট হাঁ করে তাঁকে গিলে ফেলতে এগিয়ে এল মধু ও কৈটভ। কিন্তু গিলে না ফেলে পুনরায় হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সাগরজলে। দিব্যকান্তি সেই পুরুষ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। চেষ্টা করলেন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ভগবান বিষ্ণুকে জাগাতে—কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল তাঁর। অগত্যা সেই পুরুষকে যোগনিদ্রার স্তব করতে হল। একসময় দেবীর কৃপায় অসময়ে জেগে উঠলেন বিষ্ণু। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে দেখলেন দুটি ভয়ংকর দানব হাঁ করে তেড়ে আসছে তাঁর নাভিকমলস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মার দিকে। চিনতে তাঁর ভুল হল না। এই দুই দানব একদিন সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরই কর্ণমল থেকে। এবারও বিরক্ত হলেন বিষ্ণু। তবুও মুখে বিরক্তিভাব প্রকাশ না করে দানবদের সম্বোধন করে বললেন ঃ হে মধু ও কৈটভ ! পিতামহ ব্রহ্মার অনিষ্ট করতে যেওনা তোমরা। আমার কাছে খুশিমত বর প্রার্থনা কর। বল, কি বর পেলে তোমরা সন্তুষ্ট হবে?

অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল দানবদ্বয়। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল : কি আর বর দেবেন আপনি? তার চেয়ে আমাদের কাছেই আপনি বর প্রার্থনা করতে পারেন।

মনে মনে হাসলেন ভগবান্। বুঝতে পারলেন কোন্ শক্তির অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে মদমত্ত দানবদ্বয় আজ তাঁকেও উপেক্ষা করতে চাইছে। শান্ত ও সংযত সুর ফুটে উঠল বিষ্ণুর কণ্ঠে। বললেন : হে মধু ও কৈটভ! আমি জানি তোমাদের শক্তির কথা। জগতের হিত সাধনের জন্য আমিই বর প্রার্থনা করবো তোমাদের কাছে।

একই সঙ্গে বলে উঠল তারা : বলুন; কী বর আপনি চান? কথা দিলাম প্রার্থিত বর আপনাকে প্রদান করবোই।

মুচকি হেসে বললেন বিষ্ণু : তবে তাই হোক! আমাকে এমন বর দাও যাতে আমি বধ করতে পারি তোমাদের।

মধু ও কৈটভ এমন বরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভাবতে পারেনি যে বিষ্ণু তাদের বধ করতে চাইবেন। নিজেদের পতন নিজেরাই ডেকে আনল ভেবে একটু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, তথাপি চতুরতা অবলম্বন করে বলল তারা : হে পরুষোত্তম! আমরা বলবান হলেও জগতের ন্যায় ও সত্য ধর্ম পালন করে থাকি। তবে দুটি শর্তে আপনি আমাদের বধ করতে পারবেন। প্রথম শর্ত, আমাদের যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে আপনাকে। দ্বিতীয় শর্ত, জলের উপর হত্যা করা চলবে না—হত্যা করতে হবে ঐ অনাবৃত আকাশে। একটু থেমে আবার বলল : হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার পুত্রস্থানীয়। যাতে উভয়ের শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।

বিষ্ণু মহাসমস্যায় পড়লেন। তথাপি মুখে বললেন : তোমাদের ইচ্ছা আমি অবশ্যই পূরণ করব। বর্তমানে এস আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

আরম্ভ হল মহারণ। একদিকে মহাবলশালী দুই দানব, মধু ও কৈটভ, অপরদিকে একা ভগবান বিষ্ণু। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কাঁপতে লাগল স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতল। অবাক হলেন বিষ্ণু তাদের অমিত পরাক্রম দেখে। সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ হল, তবু একটুও কাবু হল না মধু ও কৈটভ। পরন্তু নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগল বিষ্ণুকে বধ করার জন্যে। ভয়ানক অসুবিধায় পড়লেন বিষ্ণু। অগত্যা দেবী মহামায়াকে স্মরণ করলেন

মনে মনে। কতদিনে সদয়া হলেন দেবী। তাঁর ইচ্ছায় একদিন ভগবান্‌ সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে আনলেন দানবদের। কিন্তু তাদের বধ করবেন কোথায়? চারদিকে থৈ থৈ করছে অসীম জলরাশি। অনেক চিন্তা করে স্বীয় উরুদেশ থেকে সরিয়ে নিলেন পীতবসন। তারপর সেই অনাবৃত উরুদেশে তাদের মস্তক স্থাপন করে তীক্ষ্ণধার সুদর্শন দিয়ে ছিন্ন করলেন মস্তক। প্রলয় সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগল মধু ও কৈটভের ছিন্নদেহ। তাদের মেদ থেকে সৃষ্টি হল মাটি। তাই তো পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী।

চীন দেশেও অনুরূপ একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁরাও ধরে নিয়ে ছিলেন পৃথিবী আদিতে ছিল জলমগ্ন। এক বিশালকায় শক্তিধর পুরুষের দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর মাটি পাহাড় পর্বত। তবে তাদের কাহিনী অপেক্ষা ভারতীয় কাহিনীটির গুরুত্ব অনেক বেশী।

এবার ভারতের এই কাহিনীটি পরিকল্পনার পশ্চাতে কতখানি বৈজ্ঞানিক সত্য আছে বিচার করা যেতে পারে। তবে তার আগে বিজ্ঞানীদের মতামতটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, পৃথিবীর আদিমতম ইতিহাস সম্বন্ধে মানুষ এ পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তার সবটাই প্রায় অনুমানভিত্তিক, তবে যুক্তি যথেষ্টই আছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, একদিন এক ঘূর্ণায়মান পুঞ্জীভূত বিশাল আয়তনের ধূলার মেঘ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের। কালের গতিতে সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল একটি গ্যাস ও ধূলির বলয়। বলয়টি প্রাথমিক অবস্থায় শিশু সূর্যের চারপাশে চরকির মত পাক খাচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সে সূর্যের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারল না: ধীরে ধীরে সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সেই বলয় থেকেই কালক্রমে সৃষ্টি হল যত গ্রহ এবং উপগ্রহ। এক কথায় পৃথিবীর জন্মরহস্য এই। কিন্তু আদিম পৃথিবীটা ছিল আজকের চেয়ে ঢের গুণ বড় এবং উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থে ভরা। তারপর ঠাণ্ডা হতে হতে গ্যাসগুলো প্রথমে তরল ও পরে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হল। একই সময়ে আবার সবটা কঠিন হল না, অভ্যন্তরে থাকল যত গলিত তরল পদার্থ ও গ্যাস। এই অবস্থায় আসতে পৃথিবীর লেগেছিল কোটি কোটি বছর। ইতিমধ্যে পৃথিবী আবার বন্দী করে রেখেছিল একটা গ্যাসীয় আবহমণ্ডলকে। সেই আবহমণ্ডলে ছিল প্রচুর জলীয়

বাষ্প। পৃথিবীর উপরটা যতই শীতল হতে লাগল ততই শীতল ও ঘনীভূত হতে লাগল জলীয় বাষ্প। তারপর একদিন শুভক্ষণে আকাশের কোণে জমল মেঘ। আরও শীতল হয়ে মেঘ থেকে অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল বৃষ্টি। সে কী ভয়ানক বৃষ্টি! বছরের পর বছর ঝরল ক্রমাগত। পৃথিবীর উপরিভাগ গোটাটাই ঢাকা পড়ল জলে। হাজার হাজার বছর পৃথিবী কাটাল জলমগ্ন অবস্থায়।

এখন দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক 'জলমগ্ন পৃথিবী' কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। তবে কী ভাবে তাঁরা যে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন সেকথা বলা বড় শক্ত। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানীরা সবাই বিশ্বাস করেন আদিম পৃথিবী ছিল অত্যন্ত অশান্ত। প্রলয় সব সময় লেগেই থাকত। লেগে থাকত কুয়াশা, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত। আকাশ থাকত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অশান্ত থাকার জন্য ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে সব সময় উৎক্ষিপ্ত হত গলিত তরল পদার্থ এবং গ্যাস। কারণ ব্যাখ্যা না করলেও ভারতীয় পুরাণ 'প্রলয় সমুদ্রের' কথা উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি নির্দেশ করে আরও এক বৈজ্ঞানিক সত্য—সেই প্রলয় সমুদ্রের গভীরতা ছিল না। অতলান্ত মহাসমুদ্র হলে তার তলদেশে মধু কৈটভ হয়ত খেলা করতে পারত না।

তাহলে সমুদ্রের গভীরতা বাড়ল কেমন করে? আর কেমন করেই বা সৃষ্টি হল পাহাড় পর্বতের? বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হওয়ার দরুন এবং ক্রমাগত অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের ফলে কোথাও কোথাও ভূত্বক বসে গেল, কোথাও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ বাহিরে বেরিয়ে এসে শীতল হতে হতে রূপ নিল আগ্নেয় পর্বতের। ভূত্বক বসে যাওয়ার ফলে অনেক জায়গায় যেখানে কঠিন শিলাস্তর ছিল তাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই ভাগে সৃষ্টি হল গভীর খাদ এবং পাহাড় পর্বতের। পৃথিবীর উপরিভাগটি যেহেতু জলে পরিপূর্ণ ছিল তাই গভীর খাদগুলো জন্ম দিল মহাসমুদ্রের আর পাহাড়-পর্বতগুলো রূপ নিল ডাঙার। একদিন আগ্নেয় শিলা বা প্রাথমিক শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন করল মাটি। পুরাণে বর্ণিত সেই দুই মহাদানব মধু ও কৈটভ হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া দুটি বিশাল পর্বত নয় তো? যাদের মেদ থেকে সৃষ্টি হল মেদিনী?

প্রশ্ন উঠতে পারে পৌরাণিক যুগে ভারত যদি আসল তথ্য উদ্ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছিল তাহলে কাহিনীর অবতারণা কেন? সোজাসুজি বললে কী এমন ক্ষতি হত?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে। মানুষ নীরস তত্ত্বকথা কখনই শুনতে ভালবাসে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আজকে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও আমরা ক'জন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি? তত্ত্বকথার চেয়ে গল্প কী আমাদের কাছে বেশী প্রিয় নয়? প্রাচীন বিজ্ঞানীরাও জানতেন মানুষের মনের ভাব। তাই যে কোন নীরস তথ্যকে প্রচার করতেন একটা রূপকের আড়ালে। যাঁরা এই সব তত্ত্বের আবিষ্কারক তাঁরা সরাসরিভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সাহসী হতেন না। চিত্তাকর্ষক কোন গল্পের অবতারণা করতেন অথবা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের লীলা-রূপে চালিয়ে দিতেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার সাহস কারও ছিল না সে-যুগে। সাধারণ মানুষ পরম ভক্তিভরে গ্রহণ করত সে কাহিনী. কিন্তু একটি-বারও গুরুত্ব দিত না মূল তত্ত্বের উপর। এমন রূপক কাহিনী ভারতীয় পুরাণগুলিতে অসংখ্য আছে।

এবার ভগবান বিষ্ণুর কথায় আসা যাক। হিন্দুর পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণুকে এমনভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তির মূলাধার। সব দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি। তাঁকে জানতে পারলে জগতের কোন কিছু অজানা থাকে না। তাঁর কৃপা লাভ করতে পারলে আর কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাছেই সৃষ্টি আবার তাঁর কাছেই হয়। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সমগ্র বিশ্বজগৎ।

পৌরাণিক এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করতে গেলে ধরে নিতে হবে এই বিশ্বজগৎ স্বয়ম্ভু। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মত কী?

বিজ্ঞানীদের ধারণা কোন এক সুদূর অতীতে (যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না) মহাবিশ্বের হয়েছিল সূচনা। এই সুবিশাল বিশ্ব তখন এত বড় ছিল না। প্রসারিত হতে হতে আজকের ধারণাতীত বিশাল মহাবিশ্বে পরিণত হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন সৃষ্টির আদিতে কোথাও কোন কিছু ছিল না। কেবল বিরাজ করত অনন্ত মহাশূন্য। তাহলে কেমন করে সৃষ্টি হল আজকের এই দৃশ্য ও অদৃশ্য নক্ষত্রজগৎ?

বিজ্ঞানীদের কল্পিত বিশ্বজগৎ আবার কম বিস্ময়ের বস্তু নয়। এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীতে নাকি অবস্থান করে কোটি কোটি সূর্য এবং তাদের প্রত্যেকের গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-উল্কা-ছায়াপথ ইত্যাদি। অর্থাৎ কোটি কোটি সৌর জগৎ নিয়ে এক একটা গ্যালাক্সী। সৌর জগতের মধ্যে ফাঁকও যথেষ্ট। একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহের দূরত্ব কয়েক কোটি মাইল। এক সৌর জগৎ থেকে আর এক সৌর জগতের দূরত্ব কয়েক-শ কোটি মাইল। কেবল একটা গ্যালাক্সী নিয়ে মহাবিশ্বজগৎ নয়। এমনই হাজার কোটি গ্যালাক্সী নিয়ে সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এক গ্যালাক্সী থেকে আর এক গ্যালাক্সীর ব্যবধান কোটি কোটি আলোক-বর্ষ মাইল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মহাকাশের আঙিনায় এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে মহাকাশের বুক চিরে পৃথিবীর দিকে ছুটে এলেও পৃথিবীর জন্ম থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চার-শ কোটি বছরেও সে আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছাতে পারেনি। এখনও ছুটে আসছে। কবে যে পৌঁছাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

এমন যে মহাবিশ্ব তার খবর কী মানুষের জানার সাধ্য আছে? আর এত যে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, এরা এলই বা কোথা থেকে? অথচ বিজ্ঞানীরা মনে করেন বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে এসব কিছুই ছিল না। তাহলে বিশ্ব কেমন করেই বা সংগ্রহ করল এত অগণিত নক্ষত্র-জগতের উপাদান? কেবল তাই নয়, প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের আছে আবহমণ্ডল। আবার মহাবিশ্বে শূন্যতাও কোথাও নেই; বিরাজ করছে বিরল গ্যাস কণিকা।

বিজ্ঞানীরা বলেন নক্ষত্র-জগৎ সৃষ্টির আগে অনন্ত মহাশূন্যের এক কোণে হঠাৎ জমা হয়েছিল এক রকমের আদিম কণিকা। সেগুলো অবস্থান করল জমাটবাঁধা একটা পিণ্ডের আকারে। তার ঘনত্ব ছিল এত প্রচণ্ড যে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। একদিন তাই সেই জমাটবাঁধা পিণ্ডটা প্রচণ্ড ঘনত্বে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তারপর ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের সর্বত্র। বিস্ফোরণের ফলে আদিম কণিকা রূপ নিল প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনে। বিশ্বের যে কোন পদার্থের মূল উপাদান এই তিনটি আদিম কণা। এরাই বিভিন্ন সংখ্যায় যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে যত মৌলিক পদার্থকে। মৌলিক পদার্থগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে যুক্ত হয়ে

সৃষ্টি করেছে অসংখ্য যৌগিক পদার্থের। বিশ্বের তাবৎ যত জ্যোতিষ্কের মূল উপাদান সেই আদিম পিণ্ড থেকে বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন।

কিন্তু সেই জমাটবাঁধা পিণ্ডের আকারে আদিম কণিকা এল কোথা থেকে? এখন অবশ্য কালে ভদ্রে যে সব নক্ষত্র জগতের-সৃষ্টি হচ্ছে তাদের উপাদানের অভাব বিশ্বে নেই। কারণ গ্রহ নক্ষত্রদের ধ্বংস হচ্ছে—সেগুলো আবার ধূলিকণার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বে। আবার সেই বিরল গ্যাস কণিকা জমে হচ্ছে ধূলার মেঘ—তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নক্ষত্র-জগৎ। আদিতে তো এসব কিছুই ছিল না। তাহলে কেমন করে আরম্ভ হয়েছিল সৃষ্টির কাজ?

এইখানে এসেই থেমে গেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের কাছ থেকে আর কোন্ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা এর মীমাংসা করতে পারছেন ততদিন পর্যন্ত আমাদের ধরে নিতে হবে সৃষ্টির মূলে আছেন স্রষ্টা। সেই আদিম কণিকা যেন স্রষ্টার দেহনিঃসৃত অনন্ত তেজোরাশি। বাধ্য হয়েই কবির ভাষায় বলতে হয়—

"লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে
কাঁপাইয়ে জগৎ চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে গেল প্রচণ্ড কল্লোল
নিভে গেল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।"

মহাপ্রলয়ের কথা

উত্তপ্ত পৃথিবীর দেহটা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে জীবের বাসপোযোগী হয়ে উঠল। সে আজ কয়েক-শ কোটি বছর আগেকার কথা। প্রথমে পৃথিবীর বুকে এসেছিল উদ্ভিদ, তারপরেই জীব। ক্রম বিবর্তনের ধারায় অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, অণ্ডজ থেকে স্তন্যপায়ী, জলচর থেকে উভচর এবং উভচর থেকে স্থলচর জীবের সৃষ্টি। পৃথিবীর ভেতরে বাহিরে কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তন হয়েছে ঢের। সে পরিবর্তন প্রভাবিত করেছে জীব ও উদ্ভিদকে। তাই কত প্রাণী ধরার বুকে এল আর গেল তার হিসেব দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন চিরকাল ধরে পৃথিবীর বুকে জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারা অব্যাহত নেই। মাঝে মাঝে ধ্বংস বা প্রলয় নামে ধরার বুকে। পুরাতন জীব ও উদ্ভিদকুলের হয় সমাধি, আবার সেই সমাধির উপর গড়ে উঠে নতুন জীব ও উদ্ভিদ্-জগৎ। সৃষ্টি এবং ধ্বংস নাকি বিশ্বের খেলা। বিজ্ঞানীদের মতে এই ধ্বংস মাঝে মাঝে এমন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ জীব ও উদ্ভিদ বরফের নীচে চাপা পড়ে যায়। এই সময়টাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে তুষারযুগ বা হিমযুগ।

ভারতীয় পুরাণেও এ যুগের আভাস পাওয়া যায়। হিমযুগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যদিও কয়েকটি অনুমান খাড়া করেছেন তবুও সঠিক ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি। তবে তুষার যুগ যে কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করে সে বিষয়ে সকলে একমত। ভারতীয় পুরাণেও কারণ বর্ণনা করা হয়নি, তবে আশ্চর্যের কথা, সেই প্রাচীনকালে যেদিন বিজ্ঞানের কোন শাখাই পুষ্ট হয়ে উঠেনি, সেদিন ভারতীয় মনীষীরা কেমন করে টের পেয়েছিলেন পৃথিবীর মহাপ্রলয়ের কথা? যদিও 'হিমযুগের' কথা তাঁরা উল্লেখ করেননি তবুও তাঁদের 'মহাপ্রলয়' এবং বিজ্ঞানীদের 'হিমযুগ' প্রায় সমার্থক।

প্রাচীন ভারত কল্পনা করেছিল একটা নির্দিষ্ট সময়-অন্তে পৃথিবী হয় জলমগ্ন। পুরাণে এই ধরনের কাহিনী মাত্র একটি আছে, সেটি নারায়ণের

মৎস্যরূপ পরিগ্রহের কাহিনী। দশ অবতারের প্রথম অবতার। ভারী সুন্দর সে কাহিনী। এমন কাহিনী পরিকল্পনা এবং তার পেছনে একটা চমৎকার যুক্তি পৃথিবীর অপর কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ

একদিন ভগবান মনু স্নান করছেন নদীতে। এমন সময় একটা ছোট্ট মাছ ছুটে এসে আশ্রয় নিল মনুর হাতে। মাছটির ক্ষুদ্র শরীর দেখে দয়া হল মনুর। বুঝতে পারলেন আত্মরক্ষায় অসমর্থ মাছটি তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করছে। পরম যত্নে তাকে স্থান দিলেন আপন কমণ্ডলুতে।

দিন যায়। মাছটিও কমণ্ডলুর মধ্যে বাড়তে থাকে। একদিন মনু নিজেই বুঝতে পারলেন কমণ্ডলুতে মাছটির আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। বেশ বড় হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে বিবেচনা করে মনু তাকে ছেড়ে দিয়ে এলেন নিকটস্থ এক সরোবরে।

কেটে গেল অনেক দিন। একদিন কি কারণে মনু পথ হাঁটছিলেন সরোবরের পাশ দিয়ে। এমন সময় ভেসে এল এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর। কে যেন তাঁকে সম্বোধন করে বলছে ঃ ভগবন্! অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন।

মনু চারদিকে ভাল করে তাকালেন কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। রীতিমত বিস্মিত হলেন মনু। হঠাৎ নজরে পড়ল পুকুরের জলে বিরাট এক ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে একটা মাছ। মাছটি তীরের কাছে এসে জল থেকে মুখ তুলে অনুনয়ের সুরে বলল ঃ হে মহাত্মন্! আমায় আপনি ঠিক চিনতে পারছেন না। আমি সেই মাছ যাকে একদিন কৃপা করে ঠাঁই দিয়েছিলেন আপন কমণ্ডলুতে। আপনার দয়ায় আমার আজ সুবিশাল দেহ। কিন্তু দেব! দুর্ভাগ্য আমার, এই সরোবর আমার জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। এবার অনুগ্রহ করে আমাকে নিকটস্থ নদীতে স্থানান্তরিত করুন।

মৃদু হাসলেন মনু। তারপর পরম যত্নে মাছটিকে তুলে ছেড়ে দিয়ে এলেন সেই নদীতে—যেখান থেকে একদিন ওর ক্ষুদ্র দেহটাকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন কমণ্ডলুর মধ্যে পুরে।

আবার কেটে গেল কত বছর। সেদিনও মনু স্নান করছিলেন নদীর জলে। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। বিস্মিত মনু কিছু বুঝতে না পেরে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই ঢেউর দিকে।

এক সময় ঢেউএর উপর ভেসে উঠল একটা অতিকায় মাছের মাথা। এবার চিনতে ভুল হল না মনুর। প্রশান্ত হাসিতে ভরে গেল তাঁর সারা মুখমণ্ডল। মাছটি ততক্ষণে মনুর কাছে এসে গেছে। অভিবাদন জানিয়ে বলল ঃ হে দেবতা! এই শেষ বারের মত আমার প্রতি কৃপা করুন। আমার শরীরটা এখন এত বেড়ে উঠেছে যে, এই নদীতেও আমার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। এবার আমাকে সমুদ্রে ছেড়ে দিয়ে আসুন।

মনু মৎস্যরাজের বিশাল দেহটা অতি কষ্টে বহন করে নিয়ে গেলেন সমুদ্রে। সমুদ্রের জলে মাছটি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বার বার কৃতজ্ঞতা জানাল ঋষিকে। অতল জলে গা ঢাকা দেওয়ার আগে বলল মাছ ঃ হে মহর্ষি! আপনি আমার জীবনদাতা। আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না জানি, তবুও একটু কিছু উপকার করতে চাই।

ঋষি বললেন ঃ তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি পরম তৃপ্ত বৎস। কিন্তু আমার তো কোন কিছুরই অভাব নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে সাগরজলে খেলা করগে। মাছ গম্ভীর হল এবার। বলল ঃ হে দেব! পৃথিবীতে প্রলয়কাল আসন্ন। অদূরে ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবী হবে জলমগ্ন। জীবজন্তু, গাছ-পালা, কোথাও কিছু থাকবে না। পৃথিবীর পুরাতন সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজ থেকে তৈরি করতে থাকুন একখানি বড় ধরনের নৌকা। আর সংগ্রহ করুন পৃথিবীতে যত রকমের জীব আছে তাদের মাত্র দুটি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি গাছপালার বীজ। প্রলয় আরম্ভ হলেই আমি এগিয়ে আসব আপনার নৌকার কাছে। মাথায় দেখবেন এক বিরাট শৃঙ্গ। সেই শৃঙ্গের সঙ্গে নৌকাটা ভাল করে বেঁধে দেবেন। হাজার হাজার বছর পরে থেমে যাবে মহাপ্রলয়। আবার একদিন আত্মপ্রকাশ করবে পৃথিবীর মাটি। সেদিনের সেই সরস আর উর্বর মাটিতে ছড়িয়ে দেবেন যত উদ্ভিদের বীজ আর নামিয়ে দেবেন সংরক্ষিত যত জীব আর জন্তু।

চমকে উঠলেন মনু। মনে হল এ মাছ তো সামান্য মাছ নয়! তবে কে সে? জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মাছকে কোথাও দেখতে পেলেন না। মাছটি কখন সাগরের অথৈ জলে গা ঢাকা দিয়েছে। ধ্যানযোগে জানতে পারলেন মনু—ইনি স্বয়ং নারায়ণ। মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আপন প্রিয়তম সৃষ্টিকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হয়েছেন মৎস্যরূপে। বার বার প্রণাম জানালেন মনু।

কাহিনী যেমন হোক না কেন মহাপ্রলয়ের কথা ঠিক। জীব ও উদ্ভিদের কিছু কিছু টিকে থাকে একথাও সত্য, যদিও কাহিনীতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বেশী।

আর্য ঋষিরা মনে করতেন, পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ-জগৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে লুপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি হয় জীব ও উদ্ভিদ্। চক্রবৎ ঘুরছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। কলিযুগের অন্তে আসবে যুগপ্রলয়। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী নিমজ্জিত থাকবে জলের মধ্যে। তারপর একদিন প্রলয়ের জল সরে যাবে, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে জীব ও উদ্ভিদের ঘটবে পুনরাবির্ভাব, তখন আরম্ভ হবে সত্যযুগ—অন্ততঃ মৎস্য-পুরাণ এই কথা বলে।

এবার বিজ্ঞানীদের মতটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁরা বলেন পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে হানা দেয় তুষারযুগ। পুরাণের মত হিসেব দাখিল করেননি তাঁরা। কিংবা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে তুষারযুগ আসে একথাও স্বীকার করেন না। তাঁদের হিসেব থেকে জানা যায় পৃথিবীর চারশ কোটি বছর আয়ুতে বেশ কয়েকবার এসেছে তুষারযুগ। আদিম পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় আসত ঘন ঘন, এখন আসে একটু দেরীতে। তাঁরা নির্দেশ করেন, বিগত দশ লক্ষ বছরের মধ্যে হিমযুগ এসেছে চারবার, এবং প্রত্যেকটি যুগের অস্তিত্ব কম করে ধরলেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর। সবচেয়ে শেষের যে তুষার-যুগটি শেষ হয়েছে—সেটি আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তুষারযুগে জীবকুল একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না। অতি অল্প-স্বল্প জায়গায় কিছু কিছু টিকে থাকে। আবার এই যুগ শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই জীব সৃষ্টি তথা জীবের ক্রমবিবর্তন পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। অনেকে অনুমান করেন এই যুগে সমস্ত উত্তর গোলার্ধ বরফে চাপা পড়ে যায়। কারণও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা জানি পৃথিবীর বুক থেকে এক অদৃশ্য তাপশক্তি সর্বদাই নির্গত হচ্ছে। আবার সূর্য থেকেও আমরা তাপ পাচ্ছি। পৃথিবীর উপরে বায়ু-মণ্ডল থাকার জন্য পৃথিবী থেকে মুক্ত তাপ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারছে না এবং সূর্যের তাপকেও বড় একটা বাধা দিচ্ছে না। তবে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকে বহুলাংশে আড়াল করে রেখেছে। এই দুর্ভেদ্য

আবরণের কাজ করে একমাত্র জলীয় বাষ্প এবং কিছুটা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ওজোন গ্যাস। যদি কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘাটতি ঘটে তাহলে বিপর্যয় অবশ্যই আসবে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘাটতি কী সম্ভব ?

বিজ্ঞানীরা বলেন,—সম্ভব হবে যদি কোন স্বেচ্ছাচারী ধূমকেতুর দেহাবশেষ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ধূমকেতুরা অনেক সময় ভেঙে ছোট ছোট ধূলিকণার আকারে পরিণত হয়ে যায়। ঐসব ধূলিকণা যদি কোন প্রকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাহলে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত সমূহ জলীয় বাষ্প সেই ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়ে যাবে। পরে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জলকণাগুলো আকারে বড় হয়ে উঠলেই পৃথিবীর বুকে প্রবল বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়বে। তখন বায়ুমণ্ডল হয়ে পড়বে জলীয় বাষ্পশূন্য, পৃথিবীও হারাবে তাপধারণ ক্ষমতা ; ফলে নেমে আসবে প্রচণ্ড শৈত্য। সেই শৈত্যে পৃথিবীর উপরিভাগের সমূহ জল জমে বরফ হয়ে যাবে। তখন দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করবে তুষারযুগ।

আর একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা ধূমকেতু ভাঙ্গার কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। তাদের যুক্তি পৃথিবীর মেরুদেশের পরিবর্তন হলেই নেমে আসে তুষারযুগ। মেরুদেশের পরিবর্তন কী সম্ভব ? তাঁরা বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে এখনও লেগে আছে অস্থিরতা। অভ্যন্তরে কোথাও যদি কোন বিরাট পরিবর্তন আসে তাহলে মেরুর স্থান-পরিবর্তন হতে বাধ্য। পৃথিবীর উপরটা অবশ্যই কঠিন কিন্তু ভেতরে আছে উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ। পৃথিবী আবার মেরুদেশকে অবলম্বন করে প্রতিনিয়ত পাক খাচ্ছে। হঠাৎ কোথাও যদি একটা বড় রকমের চাপ পড়ে অথবা ভেতরে যদি একটা ভয়ঙ্কর ভাবে পরিবর্তন আসে তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠের অপর একটা জায়গা ফুলে উঠবে এবং মেরুতে পরিণত হয়ে যাবে। মেরুদেশ অত্যন্ত শীতল হবেই। পূর্ববর্তী মেরুদেশ থেকে বরফকে সরে যেতে দীর্ঘদিন লাগবে আবার নতুন মেরুর উপর বরফ জমা হতে হতে সমস্ত জীবজন্তু গাছপালাকে গ্রাস করে নেবে।

কারণ যাই হোক না কেন তুষারযুগের কথা সত্য ঘটনা এবং এযুগের স্থিতিকালও হাজার হাজার বছর। অর্থাৎ পৃথিবী স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত এই যুগ চলতে থাকে। বিজ্ঞানীর ভাষায় তুষারযুগ যদি হাজার

হাজার বছর কাল স্থায়ী হয় তাহলে পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী "ষাট সহস্র বছর পৃথিবী ছিল জলমগ্ন; নারায়ণ ছিলেন অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন" কথাটা অস্বীকার করা যায় কেমন করে।

বিজ্ঞানীদের তুষারযুগ কল্পনার ঢের আগে হিন্দুরা মহাপ্রলয় বা যুগ-প্রলয়ের কল্পনা করে গেছেন। মোটামুটি একটা কালও তাঁরা নির্ধারণ করেছেন। তবে তাঁদের কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কল্পনার বিশেষ মিল দেখা যায় না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবীর বয়স চারশ কোটি বছরের কিছু অধিক। পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে কোন ভুল নেই। ভূগর্ভ থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রেডিয়ামের মধ্যে সীসার পরিমাণ দেখে পৃথিবীর বয়সের নির্ভুল হিসাব করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর বয়স চারশ কোটি বছরের অধিক কাল হলেও বিজ্ঞানীরা মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত যা হস্তগত করতে পেরেছেন তাতে মনে হয় মানুষ এসেছে আজ থেকে মাত্র আড়াই লক্ষ বছর আগে। সে মানুষ আবার আজকের মানুষের মত ছিল না। তারা ছিল অর্ধবানরাকৃতি। কথা বলতে এবং কাপড় পরতে জানত না। গাছের ডালে কিংবা পাহাড়ের গুহায় রাত্রি যাপন করত। আগুন জ্বালাতে জানত না, কাঁচা মাংস এবং গাছের কচি পাতা, শামুক, গুগলি ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করত। পরের দিকে তারা প্রস্তরের ব্যবহার শিখল। প্রায় দু-লক্ষ বছর ধরে চলেছিল প্রস্তর যুগ। তার পরেই আরম্ভ হয়ে গেছে তামার যুগ। সেটি শেষ হয়েছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। পৃথিবীর বহু স্থান থেকে প্রাপ্ত আদিম মানুষের কঙ্কাল দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এগুলির বয়স প্রায় দশ হাজার বছরের মধ্যে, মাত্র কয়েকটিকে দশ হাজারের পূর্বে কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে স্থান দিতে চান। এখন একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, যে পৃথিবীর বয়স চার-শ কোটি বছর সেই পৃথিবীতে মানুষ আসতে এত দেরী হল কেন? মোটামুটি হিসাব করলে বোঝা যায় পৃথিবীর স্থলভাগের বুকে জীব আসতে লেগেছিল প্রায় দেড়শ কোটি বছর। তাহলে জীবের ক্রম বিবর্তনের ধারায় মানুষ আসতে কী লেগে গেল প্রায় আড়াইশ তিনশ কোটি বছর? যদি মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছরে অর্ধ বানরাকৃতি মানুষ আজকের সভ্য মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে, তাহলে বানর আসতে কি তিনশ কোটি বছর লেগে গেল?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বড় কষ্টকর। বিজ্ঞানীরা তো ধরে নিয়েছেন মাত্র এক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে কোন মানব-সভ্যতাই ছিল না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু একথা বলে না। বিজ্ঞানীদের চোখে একেবারে অবিশ্বাস্য হলেও তত্ত্বটুকু তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা গেল না।

পুরাণসমূহে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা আছে তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে আরও আগে অর্থাৎ কোটি বছর পূর্বে। তবে কয়েক লক্ষ বছর পরে বা এক-একটা মহাযুগ অন্তে হয় মহাপ্রলয়। একটি মহাযুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের সমষ্টি। মহাযুগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বছর। এই সময় পরে. পৃথিবীর সৃষ্টি একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায় না। অতি সামান্য অংশ টিকে থাকে। হাজার হাজার বছর ধরে বিরাজ করে প্রলয়কাল। তারপর আরম্ভ হয় সৃষ্টির কাজ। কেবলমাত্র এইখানে থেমে যায়নি পুরাণ। আরও বলেছে এমনই হাজার বার ধরে চলবে ধ্বংস ও সৃষ্টির কাজ। হাজার বার অর্থাৎ হাজারটা মহাযুগ—যার পরিমাণ এক কল্প। এক কল্পের পরিমাণ দাঁড়ায় (৪৩২০০০০ × ১০০০) চারশ বত্রিশ কোটি বছর। এই সময়ের পরে পৃথিবীর সৃষ্টি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে এমনকি পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেখানে জীব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ দেখবেন সেইখানে জীব সৃষ্টি করবেন। পৌরাণিক মতবাদ অনুযায়ী একাত্তরটি মহাযুগ এক-একজন মনুর শাসনে থাকে। একাত্তরটি মহাযুগ (৪৩২০০০০ × ৭১ বৎসর) প্রায় তিন কোটি ছ'লক্ষ বাহাত্তর হাজার বছর ধরে একজন মনু পৃথিবী শাসন করেন। জীব সৃষ্টির আদি থেকে মাত্র ছয় জন মনুর কাল গত হয়েছে, বর্তমানে চলছে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল। পুরাণের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে জীব সৃষ্টি থেকে (৪৩২০০০০ × ৭১ × ৬) এক-শ চুরাশি কোটি তিন লক্ষ কুড়ি হাজার বছর এবং সপ্তম বৈবস্বত মনুর কালকে ধরলে প্রায় দু-শ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মানুষের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র জীবের কথা ধরলে বিজ্ঞানীদের মতের সঙ্গে পুরাণের মতের বিশেষ গরমিল হয় না।

এবার পৃথিবীর ধ্বংসের কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। পুরাণ মনে করে চারশ বত্রিশ কোটি বছর অন্তে পৃথিবী হবে জীব ও উদ্ভিদশূন্য। এক রকম পৃথিবীর ধ্বংসের কথাই ধরতে হবে। জীব সৃষ্টি থেকে গত হয়েছে প্রায়

দু-শ কোটি বছর, আরও প্রায় আড়াইশ কোটি বছর টিকে থাকবে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বর্তমান জীব ও উদ্ভিদ জগতের বাসোপযোগী অনুকূল পরিবেশ। বিজ্ঞানীরাও একটা ধ্বংসের কাল অনুমান করেছেন। তারা বলেছেন সূর্য যতদিন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পৃথিবীর কোন ভয় নেই। মাঝে মাঝে এক-একবার ধ্বংস হয়ত আসবে কিন্তু জীবজগৎ টিকে থাকবে। পুরাতন সভ্যতার উপর গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতার ইমারত।

সূর্য তাহলে কতদিন স্ব মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন?

সূর্য বয়সে তরুণ বলা যেতে পারে। তার জন্ম থেকে মাত্র অর্ধেক বয়স অতিক্রম করেছে। আরও পাঁচশ কোটি বছরের মত চলবে তার হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার। আমাদের সূর্য আবার অপরিণামদর্শী নয়। সে রয়ে সয়ে খরচ করে তার হাইড্রোজেন। অতএব সূর্য টিকে থাকলেই পৃথিবীর পরিবেশ টিকে থাকবে। কিন্তু একটা সন্দেহ মনের মাঝে উঁকি মারে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে সূর্য জরাগ্রস্ত কিংবা মতিচ্ছন্ন হবে না তো? হাইড্রোজেন এখন আছে পর্যাপ্ত। কিন্তু হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার যতই কমতে আরম্ভ করবে ততই হিলিয়ামের পরিমাণ বেড়ে চলবে। ফল হবে এই, সূর্যের তাপমাত্রা যেমন বাড়বে তেমনই বেড়ে চলবে তার আয়তন। সুদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন সূর্যের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পেতে এত বড় হয়ে উঠবে যে, তার নিকবর্তী গ্রহসমূহ বুধ, শুক্র এমনকি পৃথিবীটাকেও উদরসাৎ করে নিতে পারে। তারপরেও লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর ধরে বিরাজ করবে আকাশে। অবশেষে একদিন প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠে চিরতরে নিভে যাবে। তখন সূর্যদেব তাঁর অবশিষ্ট গ্রহ এবং উপগ্রহদের নিয়ে অন্ধকারে মহাশূন্যে প্রেতের মত বিচরণ করতে থাকবেন।

বৈজ্ঞানিক গণনায় যদিও সূর্যের আয়ু পাঁচশ কোটি বছর তবুও পৃথিবীর সৃষ্টি এতকাল ধরে টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। হয়ত আড়াইশ কোটি কিংবা তিনশ কোটি বছরের পরে জীবজগতের টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ হারিয়ে ফেলবে। পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় মত প্রায় একই কথা নির্দেশ করে।

তবে একটি বিষয়ে পুরাণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ। পুরাণ বলে, তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বছর পরে আসে মহাপ্রলয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, তুষারযুগ আসে মাত্র পঞ্চাশ হাজার থেকে একলক্ষ বছরের মধ্যে। সময় না

মিললেও ফলাফলটা মিলে যায়। ব্যাপ্তিকাল উভয়েরই মতে হাজার হাজার বছর। উভয়েই মনে করে সৃষ্টি একেবারে ধ্বংস হয় না। বিজ্ঞানীরা তো পরিষ্কার বলেছেন বিগত তুষারযুগের আগেই এসেছিল মানুষ। তারা ইউরোপের কোনো জায়গায় বাস করত। তুষারযুগ আরম্ভ হতে তারা অতিরিক্ত শীতের জন্য বাস করত গুহায়। অনেকে অনুমান করেন, এই আদি মানবরা মাথা সোজা রেখে হাঁটতে পারত না। পাগুলো ঘষে ঘষে চলত। তাদের কপালের হাড় ছিল ভয়ানক পুরু। ভ্রূর উপর উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকত। তারা নাকি ভাষারও ব্যবহার জানত। দল বেঁধে বড় বড় জন্তু জানোয়ার শিকার করত, মৃতকে কবর দিত। এই ধরণের প্রাচীন মানুষের হাড় ফ্রান্সের গিরিগুহায় পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা তুষারযুগ আরম্ভ হওয়ার কয়েক সহস্র বছর পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওরা। তারপর সেই তুষারযুগের মধ্যেই অন্য এক ধরনের মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তুষারযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার উন্নতি হল। তারপর সেই দ্বিতীয় দলও লুপ্ত হয়ে গেল। দেখা দিল আজকের মানুষের মত দেখতে অপর এক ধরনের মানুষ। এরাই প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নব প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে আজকের সভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে।

তাহলে পুরাণের মহাপ্রলয় কী কল্পনা? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মনুর দ্বারা রক্ষা করেন আপন সৃষ্টিকে। সৃষ্টিকর্তা কিংবা মনুতে অবিশ্বাস করলেও যে কোন উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক জীব টিকে থাকে, একথা সত্য। পুরাণ বলে জলমগ্ন হয়ে যায় পৃথিবী আর বিজ্ঞান মনে করে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে এমনকি সারা উত্তর গোলার্ধ বরফে ঢাকা পড়ে যায়। সুদূর অতীতে পুরাণ কেমন করে এমন অসম্ভব কল্পনা করেছিল? তবে কী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ? ভারতীয় সভ্যতা কী টিকে আছে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে?

বিজ্ঞানীরা আরও একটি তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁরা বলেন আদিতে পৃথিবীর স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন ছিল না। সমুদ্রের প্রসারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে এক কোটি বছরেরও আগে। সেদিনের সেই অখণ্ড স্থলভাগের কেন্দ্রস্থল কী এই ভারতভূমি ছিল? পুরাণে উল্লেখ আছে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার কথা। তাদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বীপ এই জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ। কোটি বছর আগে ভারতভূমিতে কী বিচরণ করত মানুষের মত কোন জীব?

কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা উত্তরপ্রদেশে মাটির তলা থেকে সংগ্রহ করেছেন কয়েকটি কঙ্কাল। পরীক্ষা করে দেখেছেন এগুলি আধা মানুষ এবং আধা গরিলা জাতীয় জীবের হাড়। গরিলার মত মুখ ছিল তাদের, লাঙ্গুল ছিল না, দুপায়ে হাঁটত। অনেকে এই কল্পনাগুলিকে কোটি বছরের আগে স্থান দিতে চান। তবে তাঁদের বিচার নির্ভুল কি না এখনও ঠিক করে কিছু বলা যায় না। আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

তাঁদের ধারণা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পুরাণের কথাকে আর কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না।

পৃথিবীর কথা

অনেকের মতে আধুনিক যুগে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। কোপার্নিকাসের আগে মনে করা হত পৃথিবী স্থির আছে, তাকে পরিক্রমা করছে আকাশের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবাই। কোপার্নিকাস ভাবলেন এতদূর থেকে সূর্যের পক্ষে পৃথিবী পরিক্রমা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বরং পৃথিবীর পক্ষে নিজ মেরুদণ্ডের চারপাশে আবর্তনই স্বাভাবিক। তাঁর এই মতবাদ জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে মনে করে তিনি সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন নি; কেবলমাত্র মৃত্যুর পূর্বে স্বরচিত পুস্তকে আপন মনোভাব প্রকাশ করে যান। কিন্তু কেউ তাঁর মতকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

কোপার্নিকাসের মৃত্যুর বহুদিন পরে আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রচার করলেন, "পৃথিবী ঘোরে না, ঘোরে সূর্য।" পৃথিবীর মানুষ তাঁর মতবাদকে স্বীকার করে নিতে পারল না। আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। অনেক পরে মহাত্মা নিউটনই সব বিতর্কের অবসান ঘটালেন।

কিন্তু নিউটন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাসের বহু পূর্বে রচিত ভারতীয় পুরাণগুলি সূর্যকে স্থির বলে নির্দেশ করে গেছেন। আমাদের অনেকের ধারণা পুরাণগুলি অসম্ভব ও অবাস্তব কাহিনীবিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ততঃ পাশ্চাত্য দেশগুলি তাই মনে করে। আমরাও আবার পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করি, আর তাই ভারতীয় অমর কাহিনীগুলির অধিকাংশই আজ অবহেলিত। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারতীয় পুরাণগুলি একাধারে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান। যে গ্যালিলিওর সিদ্ধান্তকে আমরা ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেই সিদ্ধান্তই দেখতে পাওয়া যায় একাধিক পুরাণে। প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোকের কথা ধরা যাক—

যৈ র্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ তত্রৈবমুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবশ্চ যত্রৈতি তত্রৈ বাস্ত মনং রবেঃ॥

নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।
উদয়াস্ত মনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥

"যে স্থান থেকে সূর্য (প্রথম) দৃশ্য হয়, সে স্থানে উদয় এবং যে স্থান থেকে সূর্যকে আর দেখা যায় না সেখানে অস্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয় অস্ত নেই। (তিনি) সর্বদাই আছেন। তাঁর দর্শন ও অদর্শনই উদয় অস্ত।"

এই শ্লোকটি কী প্রমাণ করে না যে সূর্য স্থির? সূর্য যদি স্থির কল্পনা করা হয়ে থাকে তাহলে সূর্যের উদয় অস্ত হয় কী করে? এমন চিন্তা অবশ্যই প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মনে স্থান পেয়েছিল।

কেবলমাত্র বিষ্ণু পুরাণ নয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও সূর্য সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন—

'স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদেতি।"

অর্থাৎ সূর্যের অস্তও নাই, উদয়ও নাই।

এই সব উক্তি থেকে ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীনকালে ভারতের অজানা ছিল না যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে। পাশ্চাত্ত্যের আবিষ্কৃত বহু তথ্য এইভাবে ছড়িয়ে আছে ভারতীয় সাহিত্যে। এই সব দৃষ্টান্ত দেখে পাশ্চাত্য গবেষকদের কেউ কেউ নাসিকা কুঞ্চন করেন। কেউ বা মনে করেন ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্বদেশের গৌরব বর্ধনার্থে পুরাণের শ্লোকগুলির কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এমন অনেক বিদেশী পণ্ডিত আছেন, যাঁরা বিষ্ণু পুরাণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপর টীকা-টিপ্পনী রচনা করে গেছেন, তাঁরা মত পোষণ করে গেছেন যে, "পৃথিবীর আবর্তন হেতু দিন রাত হয়ে থাকে এই সত্য মনে হয় ভারতীয়রা অতি প্রাচীন কাল থেকেই জানতেন।"

পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণও পাশ্চাত্ত্য দাখিল করেছে মাত্র কয়েক শ' বছর আগে। ভারত সেই বৈদিক যুগেই কল্পনা করেছিল পৃথিবী গোলাকার এবং এর কোন আধার নেই। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় স্থাপিত। অনন্ত নাগকে আমরা বিশালকায় এক সর্পরূপে মনে করে থাকি। কিন্তু অনন্তের আর এক অর্থ মহাশূন্য। "পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় স্থাপিত" কথাটির প্রচ্ছন্ন অর্থ পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান। আর্য ঋষিরা যদি পৃথিবীকে সমতল মনে করতেন তা হলে কিছুতেই লিখতে পারতেন না, "সূর্যের উদয় অস্ত নেই"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "স বা এষণ কদাচনাস্তমেতি"

কিংবা বিষ্ণু পুরাণের "নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ" উক্তিগুলি মিথ্যে হয়ে পড়ে।

বৈদিক যুগের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীর আবর্তন এবং গোলত্বের ধারণা পাশ্চাত্যের আগে ভারতই ব্যক্ত করেছে। গ্যালিলিওর হাজার বছর আগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট্ট তার আর্যভট্টীয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে এবং ইহা "কদম্ব পুষ্পের" মত গোলাকার। যদিও পৃথিবীর গোলত্ব কেউ অস্বীকার করেন নি তথাপি আর্যভট্টের ভূ-ভ্রমণবাদকে সেদিন কেউ স্বীকার করে নিতে পারেননি।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্তাও ভারত। নিউটনের বহু পূর্বে ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "পৃথিবীর আকর্ষণবশতঃ শূন্যস্থিত জিনিস পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন কোন বস্তুকে উপর হতে পড়তে দেখি, তখন ধরে নিতে হবে সেটি পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যই নেমে আসছে মাটিতে।"

পৃথিবীর ভূ-ভ্রমণবাদ, পৃথিবীর গোলত্ব, পৃথিবীর অভিকর্ষ প্রভৃতি মূল্যবান তথ্যগুলির আবিষ্কর্তা ভারত। এইজন্য আমরা চিরকাল গর্ববোধ করতে পারি।

বৈদিক শূল্বসূত্র

জ্যামিতি অংকশাস্ত্রের অংশ বিশেষ। 'জ্যা' অর্থে পৃথিবী, "মিতি" অর্থে পরিমাপকে বোঝায়। এক কথায় "জ্যামিতি" কথাটির মূল অর্থ, যে শাস্ত্রের দ্বারা কোন স্থান বা ক্ষেত্রকে পরিমাপ করা যায়। অনেকের মতে, জ্যামিতির উৎপত্তিস্থল প্রাচীন মিশর দেশ। আজকের যে প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির পরিচয় আমরা পাই, সেই জ্যামিতির প্রচলন অবশ্য প্রাচীনকালে ছিল না। বর্তমানে পরিমিতি বলতে যা বোঝায় এককালে জ্যামিতি বলতে তাই-ই বোঝাত। জ্যামিতির প্রথম উদ্ভব নাকি মিশরদেশে। জ্যামিতির উৎপত্তির কাহিনী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনে করা হয় নীলনদের দেশ মিশর সর্ব প্রথম লাভ করেছিল সভ্যতার আলো। আরণ্যক জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে সেদিন মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল নীল নদের উপকূলে। সেখানকার মাটি ছিল উর্বর, অল্পায়াসে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। কিন্তু নীলনদের বন্যা অসুবিধা সৃষ্টি করত কৃষকদের। বন্যার জল কৃষিক্ষেত্রের সীমারেখা ধুয়ে মুছে একাকার করে দিত। অই কৃষকদের জমির সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ বার বার অনুভূত হত। সেই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য জ্যামিতি তথা পরিমিতির উদ্ভব। মিশরীয় সভ্যতা আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের। কারও কারও মতে এই সময়টা আরও বেশী হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন জ্যামিতি মিশর দেশ থেকে বেবিলন ও পরে গ্রীস দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় হাজার বছর ধরে চলেছিল গ্রীস দেশে জ্যামিতির অনুশীলন। প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির প্রকৃত উদ্ভাবক বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা হলেন প্রসিদ্ধ গ্রীক মনীষী পিথাগোরাস, ইউক্লিড, থেলস্, প্লাতো এবং আর্কিমিদিস। এঁদের মধ্যে পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডকে জ্যামিতি শাস্ত্রের দুই প্রধান দিক্‌পাল বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ জ্যামিতির কয়েকটি বিশেষ প্রণালী এঁরাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মিশর, বেবিলন, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতকে এক পংক্তিতে আসন দান করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের ধারণা, জ্যামিতি শাস্ত্রটা কেবলমাত্র মিশর, বেবিলন এবং গ্রীস দেশের একচেটিয়া ছিল।

কালক্রমে ভারতীয়রা ওদের কাছ থেকে জ্যামিতি বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল। যদিও প্রাচীন ভারতে পিথাগোরাস কিংবা ইউক্লিডের মত এতবড় জ্যামিতিবিদের পরিচয় পাওয়া যায় না তথাপি পিথাগোরাসের বহু পূর্বে প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল এই দেশে। নিদর্শন যে একেবারে নেই তা নয়। পিথাগোরাসের বহু পূর্বে রচিত কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং শুক্ল যজুর্বেদের সূত্রগুলি আজিও সে প্রমাণ সগৌরবে ঘোষণা করছে। সূত্রগুলির রচয়িতা বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি। নাম শুল্বসূত্র। এ পর্যন্ত মোট সাতটি জ্যামিতির উপর রচিত সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সূত্রগুলির আবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞবেদী নির্মাণ পদ্ধতি। ভারতীয় এমনকি কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে সূত্রগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীরও আগে। অথচ পিথাগোরাস এবং ইউক্লিডের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী।

মহর্ষি বৌধায়ন-রচিত শুল্বসূত্রগুলিই গভীর জ্যামিতিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। বৌধায়নের সূত্রগুলিতেই বর্ণিত হয়েছে যজ্ঞবেদীর গঠন প্রণালী, আয়তক্ষেত্র কিংবা ত্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তর এবং সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ সম্পর্কিত একটি উপপাদ্য। পিথাগোরাসের নামে প্রচলিত উপপাদ্যটি যা শিক্ষার্থী মাত্রকেই পাঠ করতে হয় সেটি হল "সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজটির অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।" কথিত আছে, পিথাগোরাস একবার গিয়েছিলেন মিশর দেশে। পিরামিডের দেশ মিশর। আকাশচুম্বী পিরামিডের শিখরগুলি এক দিকে যেমন তাঁর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল অপরদিকে পিরামিডের জন্য ব্যবহৃত বর্গাকার পাথরগুলিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁর উপপাদ্যটির আবিষ্কারের মূলে ছিল বর্গাকার পাথরগুলি। কিন্তু পিথাগোরাসের সেই প্রসিদ্ধ উপপাদ্যটি বৌধায়নের শুল্বসূত্রেও পাওয়া যায়। এখানে দুটি সূত্রের উল্লেখ করা হল।

১। সমচতুরস্রস্যাক্ষ্ণয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি।

'সমচতুরস্র' অর্থে বর্গক্ষেত্র এবং 'অক্ষ্ণয়ারজ্জু' অর্থে কর্ণ বিশ্রান্তরজ্জু বা কর্ণ। সূত্রটির অর্থ, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র মূল বর্গক্ষেত্রের (ক্ষেত্রফলের) দ্বিগুণ।

২। দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্যঙ্‌মানীচ যৎ পৃথগ্‌-ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।

'দীর্ঘচতুরস্র' অর্থে আয়তক্ষেত্র, 'পার্শ্বমানী' অর্থে দীর্ঘ বাহু এবং 'তির্যঙ মানী' অর্থে হ্রস্ব বাহু।

সূত্রটির অর্থ হয় 'আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র, আয়ত-ক্ষেত্রটির দীর্ঘ বাহু এবং হ্রস্ব বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের (দুইটির ক্ষেত্র-ফলের) সমষ্টির সমান।

দ্বিতীয় সূত্রটি পিথাগোরাসের উপপাদ্যের অনুরূপ। পরবর্তীকালে ভারতের মহান বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য ঐ সূত্রটির উপর গুরুত্ব দিয়ে আরও কয়েকটি জ্যামিতিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'লীলাবতী' অংশটি সে সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে।

এমনও শোনা যায়, পিথাগোরাস ভারতভ্রমণেও এসেছিলেন। বৌধায়নের সময় যদি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হয় তাহলে তাঁর রচিত সূত্রগুলি দুশ বছর পরে ভারতে আগত পিথাগোরাসের দৃষ্টিগোচর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুল্ব-সূত্রগুলি থেকে তিনি যে তাঁর উপপাদ্যটির পরিকল্পনা করেননি একথা জোর করে কে বলতে পারে? অথচ পিথাগোরাস ঐ একটিমাত্র উপপাদ্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

যাঁরা ভারতীয় জ্যামিতিকে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা মনে করেন, তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। মিশরীয় এবং গ্রীক সভ্যতা প্রাচীন ঠিকই, কিন্তু বৈদিক সভ্যতাকে যদি বা কেউ অস্বীকার করেন তাহলে ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতা যে আরও প্রাচীন সে কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পায় যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে আর যাই হোক না কেন, সেখানকার মানুষ এককালে জ্যামিতিতে যে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানকার নগর পরিকল্পনা এবং সর্ব-সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত বিরাট জলাধারটি উন্নত জ্যামিতি জ্ঞানের পরিচায়ক।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাহিনী

একটি গল্প আছে।

বনের মাঝখানে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম। অন্ধ ও জরাগ্রস্ত মহর্ষিকে দেখা-শোনা করেন তাঁরই তরুণী পত্নী সুকন্যা। সুকন্যা রাজার মেয়ে। তথাপি স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন বৃদ্ধ চ্যবনকে। রূপগুণের অন্ত নেই সুকন্যার। ঘরের কাজকর্ম করেন, বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করেন, বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করেন, আবার ঋষির জপতপের ব্যবস্থা করেন।

বনের ভেতরে আছে বিরাট এক সরোবর। সুকন্যা নিত্য স্নান করেন সেখানে আর পানীয় জল ভরে নিয়ে আসেন কলসীতে। সেদিনও স্নান সেরে কলসীকাঁখে কুটীরের দিকে ফিরে আসছিলেন সুকন্যা, পথিমধ্যে দেখা হয়ে গেল দুজন প্রিয়দর্শন তরুণের সঙ্গে। এই নির্জন বনে এর আগে কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হত না সুকন্যার। তরুণদের দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। তরুণদ্বয়ও অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সুকন্যার দিকে। এক সময় তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন : কে তুমি প্রিয়দর্শিনি? এর আগে তো কখনও দেখিনি তোমায়?

মৃদু হাসলেন সুকন্যা। বললেন : আমারও সেই একই প্রশ্ন হে অপরিচিত-দ্বয়! দীর্ঘকাল এই বনে বাস করছি আমি। কিন্তু কোনদিন তো দেখিনি আপনাদের! তরুণটি হেসে জবাব দিলেন : আমরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই বনপথ দিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু তুমি কে? সুকন্যা অভিবাদন জানিয়ে বললেন : আমি সুকন্যা, মহর্ষি চ্যবনের পত্নী। শিউরে উঠলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বিস্ময়ভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তারপর এক সময় যেন আপন মনেই বলে উঠলেন : তুমি চ্যবনের পত্নী? শুনেছি তিনি তো অশীতিপর বৃদ্ধ সম্পূর্ণ চলৎশক্তিহীন। তাঁকে বরণ করে কেন ভুল করলে প্রিয়সখি? সুকন্যা তাঁদের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ম্লান হাসি হাসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে অশ্বিনী-

কুমারদ্বয় পুনরায় বললেন ঃ আমরা তোমায় দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। বল সখি, কী উপকার তোমার আমরা করতে পারি ?

সুকন্যা অল্প সময় মৌন থেকে বললেন ঃ হে দেবদ্বয় ! শুনেছি আপনারা ভেষজ বিদ্যায় পারদর্শী। যদি আমার প্রতি একান্তই কৃপা করে থাকেন তাহলে আমার স্বামীর বার্ধক্য দূর করে তাঁকে পুনর্বার যৌবন দান করুন। হাসলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না প্রিয়সখি ! পরে একদিন আসব তোমার কুটীরে।

সেদিন তাঁরা চলে গেলেন। কিছুদিন পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সত্যই আগমন করলেন চ্যবনের কুটীরে। দিয়ে গেলেন একটি ওষুধ এবং জানিয়ে গেলেন ওষুধটির সেবনবিধি।

ঐ ওষুধ সেবনেই মহর্ষির বার্ধক্য দূর হয়ে গেল, পেলেন নতুন যৌবন। খুশী হলেন সুকন্যা, খুশী হলেন চ্যবনও।

ঋগ্বেদ ও অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণাদিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে সূক্ত রচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও অশ্বিদ্বয় প্রধান। অশ্বিদ্বয়ই পরবর্তীকালে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে পরিচিত হন। তাঁরা যমজ ভ্রাতা বলে অনেকে অনুমান করেন। চেহারায় তাঁদের অদ্ভূত সাদৃশ্য। ঋগ্বেদে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের মত। সূক্ত-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন ঘোষা নাম্নী এক জরৎকুমারী। ঘোষা কক্ষীবান ঋষির কন্যা, অল্পবয়সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতেন। বেদবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়েও সাংসারিক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে না পারায় তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ঘোষা একদিন অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করেছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সূক্ত রচনা করেছিলেন ঘোষা। দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত দুটি ঘোষার রচনা।

অবশ্য বৈদিক যুগে ঘোষার মত আরও অনেক ব্রহ্মবাদিনী মহিলা ঋষির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা কোন-না-কোন দেবতার উদ্দেশ্যে সূক্ত রচনা করেছেন। সে যুগে সমাজে নারীর পুরুষের সমান অধিকার ছিল এবং নারীরা ও পুরুষদের

সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। ঋগ্‌বেদে সূক্ত-রচয়িত্রী মহিলা ঋষিদের মধ্যে আছেন মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী, অম্ভন ঋষির কন্যা বাক্‌, মহর্ষি অত্রির কন্যা অপলা, অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা, বিদর্ভরাজনন্দিনী এবং মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা, মহর্ষি কশ্যপপত্নী দেবমাতা অদিতি, রাজা ভরতের পত্নী রাজ্ঞী শশীয়সী, দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী জুহু, কক্ষিবান ঋষির কন্যা ঘোষা এবং বধ্রিমতী নামে আর একজন ঋষিকন্যা প্রধান। এঁদের মধ্যে ঘোষা এবং বধ্রিমতী উভয়েই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে ঋণী ছিলেন। সেই-জন্যে মনে হয় এঁরা কেবল অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সূক্ত রচনা করেছেন। ঘোষার উক্তিই প্রমাণ করে—

যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং
যুবং সযুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে।

"তুমি বধ্রিমতীর প্রসববেদনা দূর করে সুখপ্রসব করিয়েছিলে।" ঘোষা চ্যবন ঋষির কথাও উল্লেখ করেছেন। ঘোষা আরও বলেছেন—

যুবং বিপ্রস্য জরনামুপেয়ুষঃ
পুনঃ কলেরকৃনুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বন্দন মৃশ্যদাদু দুপযুর্যুবং
সদ্যো বিশপলামেতবে কৃথঃ॥

"কলি নামে যে স্তোতা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তাকে তোমরা (অশ্বিনী-কুমারদ্বয়) পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করেছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করেছিলে, তোমরাই ছিন্নপদা বিশপলাকে লোহার চরণ দিয়ে চলৎশক্তিবিশিষ্ট করেছিলে।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা ঋগ্‌বেদে আরও পাওয়া যায়। ঘোষাই এক জায়গায় বলেছেন, "তোমরা অন্ধ ঋজ্রাশ্বের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলে।" মহাভারতেও দেখি মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য উপমন্যু অর্কপত্র খেয়ে অন্ধ হয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেছিলেন। গুরু ধৌম্যশিষ্যকে কূপ থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেননি। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রচেষ্টায় পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলেন উপমন্যু।

ঋগ্‌বেদে ঘোষার উক্তি এবং মহাভারতের আখ্যানগুলি থেকে মনে করা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। সেযুগে

অন্ধের অন্ধত্ব মোচন করা হত, অকর্মণ্য হস্তপদাদি কর্তন করে কৃত্রিম লৌহঅঙ্গ জুড়ে দিয়ে পঙ্গুকে চলৎশক্তি দান করা হত, প্রসূতির প্রসববেদনা দূর করে তার সুখপ্রসবের ব্যবস্থা করা হত। এমনকি কুষ্ঠ ব্যক্তিকেও নিরাময় করা হত। উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে মনে করা সঙ্গত যে. সে যুগের চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে বর্তমানের উন্নত শল্য চিকিৎসা প্রণালীর মোটেই তফাত ছিল না। তবে বর্তমানের মত এই শাস্ত্র বহুল প্রচারিত ছিল না। কয়েকজন অমিত প্রতিভাধরের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। মহাভারত এবং পুরাণগুলির কোন কোন কাহিনীকে নিছক গল্প বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু বেদকে নিশ্চয়ই কল্পনা বা অতিরঞ্জন বলে মনে করা যায় না। কারণ বেদে উচ্চারিত সূক্তগুলির প্রবক্তা ঋষিরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তাঁরা যা দেখেছিলেন বা উপলব্ধি করেছিলেন, কেবল সেই কথাগুলিই উচ্চারণ করেছেন। কল্পনার ঠাঁই সেখানে নেই। ঘোষার স্তব অন্ততঃ সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। হয়ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছে তিনি উপকৃত বলে কিছুটা ভক্তির আতিশয্য থাকতে পারে, তথাপি নিজেকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা বলে প্রচার করে ভক্তি প্রকাশ করার কোন হেতু নেই। তাছাড়া ঐ কাল ব্যাধি থেকে তিনি যে আরোগ্য লাভ করেছিলেন একথাও স্বীকার করেছেন। আর চ্যবন, বধ্রিমতী, ঋজ্রাশ্ব এঁরা কেউই কাল্পনিক ব্যক্তি নন। পরবর্তীকালে রচিত পুরাণগুলিতে এঁদের কথা অনেক বলা হয়েছে। পুরাণ যদিও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, তবুও বহু কাহিনীর পাত্রপাত্রী ঐতিহাসিক।

বেদ পুরাণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সুনিপুণ চিকিৎসা প্রণালীর কথাই বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সবাই স্বীকার করেছেন, এই দুই যমজ ভ্রাতা দুজন দেবতা। দেবতাদের অসাধ্য কোন কাজ নেই, এমন একটা তর্কও এসে পড়ে। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের উপর দেবত্ব অপেক্ষা মানবত্বই আরোপ হয়েছে বেশী। এঁরা লোকালয়ে ঘুরে বেড়ান, বনপথ ধরে হাঁটেন, যজ্ঞভাগ পান না। যজ্ঞভাগ না পাওয়ার কারণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসক বৃত্তি দেবসমাজে হীন ছিল বলে দেবতাদের সঙ্গে একাসনে বসার ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করার সম্মান লাভে বঞ্চিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়। একথা যদি সত্য হয় তাহলে জেনে শুনেও অশ্বিনীকুমারদ্বয় কেন হীন বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন? যে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে তাঁরা চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, সেই ইন্দ্র কেন পতিত

নয়? অপরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা করতেন বলেই কী তাঁরা পতিত? এ যুক্তি ঠিক নয়। প্রাচীনকালে চিকিৎসকের বৃত্তি হীন ছিল না। ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি থেকে অন্ততঃ সে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম প্রচলিত হওয়ায় নীচ জাতীয় ব্যক্তিদের মল, মূত্র, রক্ত. পুঁজ ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হত বলে চিকিৎসকের বৃত্তি হীন বলে পরিগণিত হয়। বৈদিক যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞান অবশ্যকর্তব্য ছিল। ব্রহ্মর্ষিরাও এই শাস্ত্রকে অবহেলা করেননি। বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিরা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। তখনকার দিনে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ না করতে পারলে ব্রহ্মকে জানা যেত না বলে ব্রহ্মর্ষিদের বিশ্বাস ছিল। অনেকের মতে আয়ুর্বেদ ছিল আবার বেদের একটি অংশ।

তাহলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যথাযথ পরিচয় কী? দেবতা না মানব? প্রাচীন কালে দেবতা এবং স্বর্গ সম্বন্ধে মানুষের যে কেমন ধারণা ছিল সে-কথা বলা বড় শক্ত। প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে আমরা দেখতে পাই, দেবতারা কখনও একক, কখনও বা দল বেঁধে আসছেন স্বর্গ থেকে, মর্ত্যের মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করছেন যজ্ঞভাগ, পৃথিবীর মানুষও অবললীলাক্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্বর্গে, ধরার মানুষকে আবার শ্রদ্ধা করতেন দেবতারা। স্বর্গে গেলে নিজে হাতে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে অভ্যর্থনা করছেন। দেবতাদের রাজা হওয়ার জন্যও কোন কোন মানুষ সচেষ্ট হতেন, ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে ইন্দ্র যে-সব ছলচাতুরী অবলম্বন করতেন তাতে তাঁর মধ্যে মানবিক গুণই প্রকট।

কিছু কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন মধ্য এশিয়ার পামির অঞ্চলে, আমু-দরিয়া ও সিরদরিয়া নদীদ্বয় বিধৌত সুবিস্তীর্ণ সমতল খণ্ডে আর্যরা বাস করতেন। তাদেরই একটি শাখা ভারতবর্ষে এসেছিলন। তারও পূর্বে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু অথবা অন্য কোন কারণে আর্যরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। আর্যরা একই সময়ে সবাই আসেননি. এক একদল এক এক সময়ে এসেছিলেন। তখন ভারতেও বাস করতেন একদল মানুষ। তাঁরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানে কম উন্নত ছিলেন না। তবুও লোহার ব্যবহার তাঁরা জানতেন না। যুদ্ধে অশ্ব ব্যবহার করতেন, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত আর্যদের কাছে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন পিছু হটতে। আর্যরা এখানে বসতি স্থাপন করলেও জন্মভূমির

প্রতি তাঁদের টান ছিল। সেখানে বাস করতেন যত জ্ঞানী গুণীরা, মাঝে মাঝে আসতেন ভারতভূমিতে, শক্তিশালী যাঁরা তাঁরা আর্যদের হয়ে ভারতের আদিবাসীদের (অসুর নামে খ্যাত) সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। আর্যদের আদি নিবাস স্বর্গ নামে এবং সেখানকার জ্ঞানী-গুণীরা দেবতা নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে আরও দেখা গেছে, আর্যদের যে সব শাখা ভারতে প্রবেশ করেছিল তাঁদের কারও সঙ্গে কারও মিল ছিল না। প্রত্যেক দলের উপাসক ছিলেন একজন বিশেষ দেবতা। একদলের দেবতাকে অন্য দল স্বীকার করতেন না। আদি বাসস্থান স্বর্গে হয়ত গণতন্ত্রের মত ব্যবস্থা ছিল। যিনি শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে, পরাক্রমে সবার সেরা বিবেচিত হতেন তিনিই রাজপদের যোগ্য বলে নির্বাচিত হতেন।

অনেক ক্ষেত্রে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, দেবতাগণ স্ব-স্ব-লোক থেকে অবতরণ করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন। অনেক সময় দেবতাদের পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে। শেষে ছলে-বলে-কৌশলে দানবদের আয়ত্তে এনেছেন। অমিত পরাক্রমশালী দানবদের দর্প চূর্ণ করায় আর্যরা তাঁদের গুণ-কীর্তন করেছেন, স্তব রচনা করেছেন এবং যজ্ঞক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে যজ্ঞভাগ দিয়ে আপ্যায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে দানব তথা অসুরদের নীচ এবং হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যোদ্ধা ছিলেন না। ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতির মত কোন পরাক্রমশালী অসুরকেও বধ করতে পারেন নি, তাই পরবর্তীকালে যাগযজ্ঞ প্রচলিত হলে যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রণও পেতেন না।

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে কাউকে জগৎস্রষ্টা পরমপিতা রূপে কল্পনা করা হয় নি। বেদের পরবর্তী উপনিষদের যুগে ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়েছে। তিনি নির্গুণ ঈশ্বর, বিশ্বের মূলাধার তিনিই। সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তাই দেখা যায় তাঁকে জানার জন্য দেবতা এবং মানুষ উভয়েরই কৃচ্ছ্রসাধন। উপনিষদের যুগের পরে তাঁর কল্পনা আরও ব্যাপক। বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছেন তিনি; তিনিই সৃষ্টি করেন, আবার লয়ও তাঁর কাছে। তিনি নিজেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বিরাজ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ একই অঙ্গের দুইরূপ। অনন্ত শক্তিমান তিনি। অনন্ত রূপরাশি নিয়ে অনন্তকাল ধরে বিশ্বে পরি-ব্যাপ্ত। দেবতা, মানব, অসুর, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ তাঁরই ইচ্ছার ফল। ঋগ্বেদের

দেবতাদের মধ্যে এমন গুণের ভগ্নাংশ মাত্র কারও মধ্যে নেই। সর্বশক্তিমান তাঁরা কেউ নন। বিপদে পড়লে শিশুর মত কাঁদেন, অসুরেরা স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিলে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেন, আর সর্বশক্তিমানের আরাধনা করেন। সুখের সময় সুরা এবং নারীতে আসক্ত হন, মানুষের এবং দানবের সদ্‌গুণ দেখলে বিচলিত হন, পরস্ত্রী এমন কি গুরুপত্নীকে হরণ করতে এদের লজ্জা হয় না। তাহলে এই সব দেবতা কারা ? দেব না মানব ?

স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কোন মিল নেই। সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের সমকক্ষ। তাঁরা একদিকে যেমন ইচ্ছামত পতি বরণ করতে পারতেন অপর দিকে এক নারীর একাধিক পতিও সমাজে দূষণীয় ছিল না। দ্রৌপদীর পঞ্চপতি, কর্ণ যুধিষ্ঠিরাদি বা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্মকাহিনী আজকের সমাজের চোখে অশ্লীল বলে মনে হলেও সে যুগে এইটাই ছিল সামাজিক রীতি। পরিবর্তনশীল সমাজ। আজকের সমাজ-ব্যবস্থা হাজার বছর পরে সমানভাবে টিকে থাকবে না: কথিত আছে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুই আজকের সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তক। নারীর বহুপতি বরণ করাকে তিনি ঘৃণা করতেন।

দেখা যাচ্ছে আচারে-আচরণে, সমাজ-ব্যবস্থায় দেবতা ও মানুষের মধ্যে কোন গরমিল নেই। ইন্দ্র, বরুণ, যম, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হয়ত কেউই দেবতা ছিলেন না। ছিলেন অসামান্য প্রতিভা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী দেবতুল্য মানব। অদিতি যদি সমস্ত দেবগণের মাতা হয়ে থাকেন এবং মহর্ষি কশ্যপ যদি দেব ও দানব উভয়েরই পিতা হন, তাহলে এসব কথা আলোচনার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। পরম ভকতবৎসল শ্রীহরির সঙ্গে এঁদের কোন যোগাযোগ নেই বললেও চলে। তিনি স্বয়ম্ভূ। দানবভীতি, দুঃখকষ্ট এবং অধর্ম অপসারণের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজেই অবতীর্ণ হন ধরাধামে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবতা ও মানব উভয়েরই আরাধ্য।

অতএব অশ্বিনীকুমারদ্বয় মানব। তাঁদের জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন কর্মস্থান প্রাচীন ভারতভূমি। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আবার মহর্ষি কশ্যপের যমজ সন্তান বলে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। ঋগ্‌বেদের মতে দ্যুস্থানীস্থিত দেবতাদের মধ্যে মুখ্য এই দেবতাদ্বয়। এঁদের 'অশ্বিদ্বয়' আখ্যা দেওয়ার কারণ, এঁদের একজন রসের দ্বারা অপরজন জ্যোতির দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত

করেন। কোন কোন সমালোচকের মতে এঁরা দিন ও রাত্রি। অপর একদল সমালোচক বলেন অশ্বিদ্বয় সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া কেউ নন। ঐতিহাসিকদের মতে এঁরা পুণ্যকর্মা দুজন রাজা। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলে দেববৈদ্যরূপে খ্যাত হয়েছেন। অধ্যাপক 'গোল্ড স্ট্যুকে'র মতে অশ্বিদ্বয়ের ব্যক্তিত্বে নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক এই দুই কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এমনও হতে পারে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে প্রাচীন দুই দেবতা অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ মানব অশ্বিনীকুমারদ্বয় থেকে পৃথক্। বেদ-পুরাণের কাহিনীগুলি প্রমাণ করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে মানবীয় উপাদানই বেশী। এক্ষেত্রে মানবীয় উপাদান বলতে অসাধারণ রোগ-নিরাময় ক্ষমতাকে মনে করা যেতে পারে।

অধ্যাপক গোল্ড স্ট্যুক আরও এক ধরনের মত পোষণ করে থাকেন। তাঁর এই মত অনুযায়ী অশ্বিদ্বয় সূর্যদেবতা। সূর্যরশ্মির রহস্যময় স্বরূপ এবং তার কার্যাবলীর সঙ্গে আরোগ্য ও ভৈষজ্যের নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। প্রাচীন-কালে বোধ হয় মানুষ সূর্যালোকের গুণাবলীর টের পেয়েছিল। হয়ত তাঁরা সূর্যরশ্মিকে রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতেন। সুফল অবশ্যই পেতেন। তা না হলে সূর্যের বিশেষ দু-ধরনের রশ্মি বা অশ্বিদ্বয়ের এত গুণপনা ব্যাখ্যা করতেন না (অবশ্য অধ্যাপক গোল্ড স্ট্যুকের মত যদি সত্য হয়)।

গোল্ড স্ট্যুকের এই মতকে অনেকে সমর্থন করেন। আজকের বিজ্ঞান বুঝতে পেরেছে সূর্যরশ্মির অসাধারণ ক্ষমতার কথা। মানুষ সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করতে চাইছে। সূর্যরশ্মির রোগ নিরাময় ক্ষমতাও আমাদের অজানা নয়। যদি প্রাচীনকালে ভারত সূর্যরশ্মিকে রোগ নিরাময়ের কাজে প্রয়োগ করে থাকেন তাহলে এই ঘটনা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতাই প্রমাণ করে। আমরা অনেকে হয়ত একথা স্বীকার করতে চাইব না, তবুও সূর্যরশ্মিকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করতে দোষ কোথায়?

চন্দ্রদেবের কাহিনী

চন্দ্র সম্বন্ধে ভারতীয় পুরাণগুলিতে একাধিক কাহিনী বর্তমান। বেদে চন্দ্র একজন প্রধান দেবতা। কিন্তু ঋগ্‌বেদের স্তবগুলি থেকে চন্দ্রের কোন কাহিনী জানা যায় না? স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড প্রভৃতির মতে চন্দ্রের উৎপত্তি ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে। একবার মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গ হল লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মীহীন স্বর্গে দেবতাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। বাধ্য হয়ে তাঁরা শরণাপন্ন হলেন ভগবান বিষ্ণুর। বিষ্ণু সব শুনে উপদেশ দিলেন ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করতে। এই কঠিন কাজ দেবতাদের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না; বাধ্য হয়ে অসুরদের সঙ্গে নিতে হল। মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকী নাগকে রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করে একদিন দেবাসুর মিলে মন্থন করলেন ক্ষীরোদ সাগর। মন্থনের ফলে একে একে আবির্ভূত হলেন ধন্বন্তরি, পারিজাত, ঐরাবত, লক্ষ্মী, অমৃত এবং দুর্লভ রত্ন চন্দ্র। ইতিমধ্যে মন্থনজাত তীব্র হলাহল পান করে মহাদেব হয়েছেন নীলকণ্ঠ। তাঁর কণ্ঠের বিষজ্বালা নিবারণার্থে দেবগণই এই দুর্লভ রত্ন দান করলেন মহাদেবকে। মহাদেব স্থান দিলেন চন্দ্রকে স্বীয় মস্তকে।

চন্দ্রের আর একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শিবপুরাণ এবং বায়ুপুরাণে। কাহিনীটি বৃহৎ হলেও সরস ও সুন্দর। শিবপুরাণে আছে, চন্দ্র প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র ও মহর্ষি অত্রির পুত্র। মহর্ষি অত্রি বহু বছর ধরে অনিমেষ নয়নে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যারত অবস্থায় তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে নির্গত হয় তীব্র সোমরশ্মি। সেই রশ্মিধারণক্ষমতা দিগ্‌অঙ্গনাদেরও ছিল না। বাধ্য হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা রশ্মিগুলিকে একত্রিত করে রথে আরোহণ করলেন। সোমরশ্মি থেকে জন্ম নিলেন সোম। ব্রহ্মা ক্রমাগত একুশবার ধরে সোমকে নিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। সোমের তেজ অধিকাংশ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। সেই তেজ থেকে জন্ম নিল পৃথিবীর যত ওষধিবর্গ। ব্রহ্মা সোমকে ওষধিবর্গ, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণদের রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন। দক্ষ-

প্রজাপতি সোমকে সম্প্রদান করলেন আপন সাতাশটি কন্যা। গৌরবান্বিত সোমদেব রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। রাজপদ লাভ করেই চন্দ্রদেবের হল বুদ্ধিভ্রংশ। একদিন গোপনে হরণ করেই আনলেন দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী অসামান্যা সুন্দরী তারাদেবীকে। ভর্ৎসনা করলেন তারা চন্দ্রদেবকে—

"ত্যজমাং ত্যজমাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুক!"

কিন্তু মোহগ্রস্ত চন্দ্রদেব শুনলেন না তারার কথা। বাধ্য হয়ে অভিশাপ দিলেন তারা—

'দেবকুলের কলঙ্ক হে চন্দ্রদেব! তুমি কলঙ্কী, রাহুগ্রস্ত এবং ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবে।'

চন্দ্রের কুকীর্তির কথা বৃহস্পতির কর্ণগোচর হল। ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন নিবেদন করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা চন্দ্রদেবকে ডেকে এনে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করলেন এবং আদেশ দিলেন অবিলম্বে তিনি যেন তারাকে সসম্মানে বৃহস্পতির কাছে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু মদগর্বী চন্দ্রদেব ব্রহ্মার আদেশকেও উপেক্ষা করলেন। ক্রোধান্ধ বৃহস্পতি এবার চন্দ্রকে সাজা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। দেবসমাজে প্রচার করলেন চন্দ্রদেব অতি নীচ, অহঙ্কারী এবং পরস্ত্রীহরণকারী। ক্ষেপে উঠলেন দেবসমাজ চন্দ্রের জঘন্য কীর্তির কথা শুনে। চন্দ্রকে যথোচিত শাস্তি দানের জন্য তাঁরা আহবান করলেন যুদ্ধে। চন্দ্রদেব দমবার পাত্র নন। দেবতাদের চিরশত্রু দানবদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন যুদ্ধের জন্য। দেবদানবের আসন্ন যুদ্ধে প্রমাদ গণলেন দেবাদিদেব মহাদেব। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মীমাংসা করবার জন্য নিজেই গমন করলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে আদেশ দিলেন যাতে দৈত্যরা চন্দ্রপক্ষ অবলম্বন না করে। শুক্রাচার্য অনেক বোঝালেন দৈত্যদের। তারা গুরুদেবের কথার অবাধ্য না হয়ে চন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে স্ব স্ব ভবনে যাত্রা করল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন চন্দ্রদেব। এদিকে মহাদেব তাঁকে করলেন তীব্র ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা। বাধ্য হয়ে চন্দ্রকে মহাদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হল এবং তারাকে ফিরিয়ে দিতে হল দেবগুরুর কাছে। এবার অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন চন্দ্রদেব। বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করলেন মহাদেবের কাছে। মহাদেবের ক্রোধ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। চন্দ্রকে শুদ্ধ করতে মহাদেব আদেশ করলেন

ক্ষীরোদ সাগরের জলে স্নান করে আসতে। চন্দ্রদেবও নতমস্তকে চলে গেলেন ক্ষীরোদ সাগরে। কিন্তু স্নান করার পর তাঁর শরীরে ঘটল অদ্ভূত পরিবর্তন। এক অংশ হল নির্মল অপর অংশ ধারণ করল কলঙ্কচিহ্ন। মহাদেব নির্মল অর্ধচন্দ্রকে স্থান দিলেন স্বীয় ললাটে, কলঙ্কী অর্ধচন্দ্রকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলেন সাগরকূলে। কলঙ্কী অর্ধচন্দ্র মনের দুঃখে ক্ষীরোদ সাগরের জলে ডুবে করলেন আত্মহত্যা। পুত্রের পরিণতির সংবাদ একদিন কর্ণগোচর হল মহর্ষি অত্রির। পুত্রশোকে কাতর হয়ে ছুটে এলেন ক্ষীরোদ সাগরের কূলে। চোখ থেকে নামল অবিরল ধারা। সেই অশ্রুজল একসময় এসে মিশল ক্ষরোদ সাগরের জলে। পিতার অশ্রুতে প্রাণ ফিরে পেলেন চন্দ্রদেব। পূর্বের মত তাঁর দেহে আর কলঙ্ক চিহ্ন রইল না। চন্দ্রের নতুন দেহ দেখে খুশি হলেন মহাদেব। এবারও তাঁকে পূর্বের মত রাজা করে দেওয়া হল। কেবল নির্দেশ দিলেন ভাদ্র-মাসের শুক্লা চতুর্থীর দিন চন্দ্র হবেন কলঙ্কযুক্ত। ঐ দিন চন্দ্রদেব গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেছিলেন। ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ সেই থেকে নষ্টচন্দ্র নামে খ্যাত। প্রাচীন মতানুযায়ী ঐ দিন চন্দ্রদর্শনে হয় পাপ।

চন্দ্রের ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে তারার অভিশাপ ছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং শিবপুরাণে আর একটি কাহিনী আছে। চন্দ্রদেবকে যখন দক্ষ তাঁর কন্যাদের সম্প্রদান করেন তখন বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর কোন কন্যার অনাদর না হয়। রাজপদ পেয়ে ভুলে গেলেন চন্দ্রদেব দক্ষের সাবধান বাণী। একমাত্র রোহিণী ছাড়া কাউকে সুনজরে দেখলেন না। কুপিতা অপর ছাব্বিশ ভগিনী পিতার কাছে অভিযোগ আনলেন। শোনা মাত্রই ক্রুদ্ধ দক্ষ প্রজাপতি অভিশাপ দিলেন, "চন্দ্র আজ থেকে হবেন ক্ষয় রোগগ্রস্ত।" তাঁর অভিশাপ ব্যর্থ হল না। অচিরে চন্দ্র আক্রান্ত হলেন ক্ষয়রোগে। উপায় না দেখে চন্দ্র শরণ নিলেন মহাদেবের পায়ে। আত্মভোলা মহেশ্বরের কৃপা লাভ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না চন্দ্রদেবকে। মহাদেব তাঁকে রোগমুক্ত তো করলেনই, অধিকন্তু দক্ষের রোষাগ্নি থেকে চন্দ্রকে রক্ষার জন্য নিজের কাছেই রেখে দিলেন। দক্ষ বারবার শিবকে অনুরোধ করলেন চন্দ্রকে পরিত্যাগ করার জন্য। কিন্তু শিব কানেই তুললেন না দক্ষের কথা। শেষে দক্ষ এবং শিব উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করতে মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তাঁরই অনুরোধে মহাদেব রোগমুক্ত চন্দ্রকে মাথায় করে রাখলেন, রোগযুক্ত অর্ধচন্দ্রকে সমর্পণ করলেন

দক্ষের হাতে। রোগযুক্ত অর্ধচন্দ্রই মিলিত হলেন পত্নীদের সঙ্গে। চন্দ্রের পত্নীগণ চন্দ্রের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পিতাকে অনুরোধ করলেন তাঁর অভিশাপ থেকে চন্দ্রকে মুক্তি দিতে। দক্ষ কিছুটা শান্ত হয়ে অভিশাপের একটু রদবদল করে দিলেন। পনের দিন ধরে একটু একটু করে ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবেন চন্দ্রদেব, পরের পনের দিনে আরোগ্যলাভ করবেন।

পুরাণ আরও বলে চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর পত্নীদের গর্ভে কোন সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেনি। চন্দ্রের একমাত্র সন্তান তারার গর্ভজাত পুত্র বুধ। বুধ থেকেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন পুরুরবা, নহুস, যযাতি প্রভৃতি রাজগণ। যযাতির পুত্র হতেই যাদব কুলের উৎপত্তি। দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবরাও চন্দ্রবংশোদ্ভব বলে বর্ণিত।

চন্দ্রের এই কাহিনীগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম কাহিনী অর্থাৎ সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। আগে বলা হয়েছে ভারতীয়রা নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করতেন না। তাঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে একটি মনগড়া কাহিনীর রূপ দিতেন অথবা জনপ্রিয় কোন কাহিনীর মধ্যে জুড়ে দিয়ে অপর এক কাহিনীর অবতারণা করতেন। প্রচলিত কাহিনীর সবগুলিই ছিল ঈশ্বরের লীলাবিষয়ক। মানুষ পাঠ করত এবং তাদের মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের উদ্রেক হত কিন্তু রূপকের আবরণ ছিন্ন করতে সাহসী হত না।

বর্তমানের মত সেদিনও কোন ভারতীয় মনীষী ধরে নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকেই চন্দ্রের উৎপত্তি। চন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা। পৃথিবী তার জন্মদাত্রী একথা সে যুগে কেউ স্বীকার করত না একথা আবিষ্কারক ভালভাবেই জানতেন। তাই হয়ত সমুদ্র মন্থনের গল্পটির সঙ্গে আপন মতবাদটি জুড়ে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান যদিও স্বীকার করে না পৃথিবী থেকে চন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে বলে, তবুও দীর্ঘকাল ধরে আমরা পাশ্চাত্ত্যের এক মহান বিজ্ঞানীর মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। তাঁর মতবাদটি ছিল, পৃথিবী আদিম অবস্থায় যখন তার উত্তপ্ত, তরল ও গ্যাসীয় শরীরটাকে নিয়ে সূর্য পরিক্রমা করছিল, সেই সময় পৃথিবীর পাশ দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেছল বিশালকায় এক নক্ষত্র। এই নক্ষত্র পৃথিবী থেকে অনেক গুণে বড় ছিল বলে প্রস্থানের সময় ভেঙ্গে নিয়ে গেছল

পৃথিবীর শরীরের কিছু অংশ। বিচ্ছিন্ন অংশটি আবার ছিটকে গিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারল না। কিংবা নক্ষত্রের অনুসরণ করল না। পৃথিবীর আকর্ষণের আওতায় থেকে গিয়ে পৃথিবীকেই পরিক্রমা করতে লাগল। এইভাবে হয়েছিল চাঁদের সৃষ্টি। চাঁদ যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কালক্রমে সেখানে সৃষ্টি হল গভীর এক মহাসমুদ্রের। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন আর চন্দ্রের আয়তন প্রায় সমান।

এই মতকে বিজ্ঞান এখন পরিত্যাগ করেছে। বর্তমান মনে করা হয় সূর্যদেহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যত গ্রহ-উপগ্রহ। বলয় মতবাদ নামে একটি মতবাদ আছে। ঐ মত অনুযায়ী সূর্যের জন্মের পর তার মধ্যে যখন পরিবর্তন হচ্ছিল সেই সময় একটা গ্যাস বলয় সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সূর্যের আবর্তনের বেগ তখন ছিল প্রবল। এই বিচ্ছিন্ন বলয়টিও আবর্তন করছিল সূর্যকে। কিন্তু সমান তালে চলতে না পারায় গ্যাস বলয়টি ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। যতই দূরে সরে যেতে লাগল ততই ঠাণ্ডা হতে লাগল। প্রথমে নিম্নতম স্ফুটনাঙ্কের পদার্থসমূহ ঠাণ্ডায় তরল ও পরে কঠিন পদার্থের কণায় পরিণত হল। উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের পদার্থসমূহ গ্যাসীয় আকারে অবস্থান করে আরও দূরে সরে গিয়ে ঠাণ্ডা হতে লাগল এবং পদার্থকণা বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। পদার্থের এই কণাগুলো ছিল অত্যন্ত ছোট এবং পরিমাণে প্রচুর। এদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের ফলে প্রথমে ছোট ছোট টুকরো এবং পরে বড় বড় খণ্ডে পরিণত হ'ল। যারা বড় হয়ে উঠল তাদের আকর্ষণ বলও বাড়ল। পাশাপাশি অনেক টুকরাকে আত্মসাৎ করে বৃহৎ বৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হল। অনেক দূরে যারা রইল তারা আর বড় পিণ্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল না। বড় পিণ্ডটির আকর্ষণের মধ্যে পড়ে তাকেই পরিক্রমা করতে লাগল। এই উপায়ে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি। এই মতবাদও সত্য কিনা তাও জোর করে বলা যায় না। ভবিষ্যতে আর একজন হয়ত অন্য একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করবেন, তখন দেখা যাবে যে বর্তমানে প্রচলিত তথ্যটি অপেক্ষা সেই তথ্যটি অধিক বিজ্ঞান-সম্মত। তখন পূর্ববর্তী তথ্য বাতিল হয়ে নতুন তথ্যটি বহাল হবে। তা না হলে আমরা এতকাল পর্যন্ত চাঁদকে পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করে এসেছিলাম কেন? আমরা কী পূর্বের তথ্যটিকে অবৈজ্ঞানিক মনে করি? সেইভাবে যদি কোন প্রাচীন ভারতীয় মনীষী কল্পনা করে থাকেন পৃথিবী থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি

হয়েছে, তাহলে তাঁর মতটা বা বিজ্ঞানসম্মত হবে না কেন? আমরা কি মনে করতে পারি না সমুদ্র মন্থন কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যার ফলে পৃথিবীর কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ মহাদেবের ললাটে বা মহাকাশে চাঁদরূপে শোভা পাচ্ছে?

অপর কাহিনীগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক এই তিন রকমের উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখানে ধরা হয়েছে চন্দ্র ও সোম একই দেবতা। আসলে চন্দ্র ও সোম একজন নাও হতে পারেন। চন্দ্র দেবতাবিশেষ এবং সোম জনৈক রাজা। পরবর্তীকালে যাঁরা রাজা সোমের কীর্তিকাহিনী রচনা করেছেন তাঁরা সোমের সঙ্গে চন্দ্রদেবের তুলনা করেছেন মাত্র। প্রাচীন কালে রাজবংশগুলির আবার বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তাঁরা নিজবংশকে কোন এক মহান ও তেজস্বী দেবতার বংশরূপে জাহির করেছেন। সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ ভারতীয় পুরাণে বিশেষভাবে খ্যাত। আকাশের অথবা স্বর্গের দেবতা চন্দ্রদেব এবং পৃথিবীর এক রাজা সোমদেব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাননি তো?

কাহিনীগুলির মধ্যে বর্ণিত একটি তথ্য আমাদের সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি চন্দ্রদেবের পত্নীর সংখ্যা ও নাম। প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি কন্যা সবাই চন্দ্রের পত্নী। তাঁদের নামগুলি যথাক্রমে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ এবং রেবতী। অথচ এই নামগুলি দিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু জ্যোতিষীরা নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝিয়ে এসেছেন। নক্ষত্রপুঞ্জগুলির সঙ্গে চন্দ্রের কেমন যোগাযোগ তা আলোচনা করলেই কাহিনীর আসল রহস্য উন্মোচিত হবে।

সুদূর অতীতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নয়, অন্যান্য সভ্য দেশগুলিতেও আকাশের সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ লক্ষ্য করে মাস ও বছর গণনা করা হত। ভারতে মাস হিসাবের রীতি ছিল এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা বা এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা মোট প্রায় ত্রিশদিন সময়। কিছুকাল পরে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ আকাশ পর্যবেক্ষণ করে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পান। তাঁরা দেখলেন পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র আকাশের যে বিশেষ

একটি নক্ষত্রের নিকটবর্তী থাকে পরবর্তী পূর্ণিমায় সে নক্ষত্রের কাছে থাকে না। থাকে অন্য একটি বিশেষ নক্ষত্রের কাছে। তাঁরা অনুসন্ধান করে বুঝতে পারলেন এক পূর্ণিমায় চন্দ্র যে নক্ষত্রটির কাছাকাছি অবস্থান করে সেই নক্ষত্রটির সমীপবর্তী হতে চন্দ্রের লাগে সাতাশদিনের কিছু বেশী সময়। পূর্ণিমার প্রায় আড়াইদিন পূর্বে। এই ঘটনা পরপর ঘটে থাকে। কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন জ্যোতিষীরা। এদিকে আবার লক্ষ্য করলেন দ্বাদশ পূর্ণিমা অন্তে সূর্যও অবস্থান করে বিশেষ একটি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্নিকটে। একথা অবশ্য ঠিকই যে, সূর্যের আলোকে নক্ষত্র দেখা যায় না বলে সূর্যাস্তের পরে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে, পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের তারাগুলো তাঁরা নির্দিষ্ট করে রাখতেন।

দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা গবেষণা চালিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ণিমায় চন্দ্র যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করেছিল মাত্র সাড়ে সাতাশদিন অন্তে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসে তবে সূর্য ও চন্দ্রের কাল্পনিক গতিপথ তারা নির্ণয় করে নিয়েছিলেন। তাঁরা আরও দেখতেন বছরের সবদিন সূর্য কিংবা চন্দ্র কেউই একটা নির্দিষ্ট পথে আকাশ পরিক্রমা করে না। আকাশের মাঝখানে একটা রেখার কল্পনা করে বুঝতে পারলেন সূর্য ও চন্দ্র একসময় কাছে সরে আসে, তারপর আবার ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়। এই দূরত্বও আবার নির্দিষ্ট। একটা বিশেষ দূরত্বে যাওয়ার পর আবার সমীপবর্তী হতে আরম্ভ করে। জ্যোতির্বিদরা সূর্যের প্রতীয়মান গতিপথকে 'ক্রান্তিবৃত্ত' নাম দিলেন। চন্দ্রের গতিপথ ক্রান্তিবৃত্তের উভয়দিকে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ততদূর পর্যন্ত আকাশের গায়ে বিস্তৃত এক কটিবন্ধের কল্পনা করেন। এই কটিবন্ধটির নাম দেন 'ভ' চক্র বা নক্ষত্রচক্র। কটিবন্ধকে বৈদিক যুগের জ্যোতিষীরা ভাগ করে দিলেন আঠাশ ভাগে, পরবর্তীকালে সংশোধন করে সাতাশ ভাগে ভাগ করা হল। প্রত্যেকটি ভাগকে সূচিত করার জন্য তাঁরা স্থির করলেন এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জের। সেই অনুসারে মোট সাতাশটি তারকাপুঞ্জের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছিল। পুঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল একটা তারা স্থির করে জ্যোতিষীরা নামকরণ করেছিলেন যোগতারা। তাঁদের কল্পিত নক্ষত্রপুঞ্জগুলির নাম এবং পুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত তারার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। অশ্বিনী—৩	২। ভরণী—৩	৩। কৃত্তিকা—৬
৪। রোহিণী—৫	৫। মৃগশিরা—৩	৬। আর্দ্রা—১
৭। পুনর্বসু—৪	৮। পুষ্যা—৩	৯। অশ্লেষা—৫
১০। মঘা—৫	১১। পূর্বফাল্গুনী—২	১২। উত্তরফাল্গুনী—২
১৩। হস্তা—৫	১৪। চিত্রা—১	১৫। স্বাতী—১
১৬। বিশাখা—৪	১৭। অনুরাধা—৪	১৮। জ্যেষ্ঠা—৩
১৯। মূলা ১১	২০। পূর্বাষাঢ়া—২	২১। উত্তরাষাঢ়া—২
২২। শ্রবণা—৩	২৩। ধনিষ্ঠা—৪	২৪। শতভিষা ১০
২৫। পূর্বভাদ্রপদ—২	২৬। উত্তরভাদ্রপদ—২	২৭। রেবতী—১২

বৈদিক যুগে আরও একটি নক্ষত্রপুঞ্জের কল্পনা করা হয়েছিল, তার নাম ছিল অভিজিৎ। দেখা গেছে প্রতিদিন চন্দ্র এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জকে অতিক্রম করে। সাতাশ দিন পরে যে নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল সেই নক্ষত্রের কাছে আবার ফিরে আসে। ঐ কারণে চন্দ্র যে দিন যে নক্ষত্রপুঞ্জকে অতিক্রম করে সেই দিন চন্দ্রকে উক্ত নক্ষত্রের ভোগস্থিত বলা হয়। এবার বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, কেন অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদিকে চন্দ্রের পত্নীরূপে পুরাণগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নক্ষত্রবিভাগ একমাত্র হিন্দু জ্যোতিষীদের কীর্তি। অন্য কোন দেশ চন্দ্রের ভোগস্থিত নক্ষত্রের কল্পনা করেননি। এক কথায় 'ভ'চক্র গণনা ভারতের নিজস্ব। পুরাণাদি রচনার বহু পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল এই তথ্য। তাই পুরাণ-রচয়িতা যদি নক্ষত্রগুলিকে চন্দ্রের পত্নী কল্পনা করে কোন রূপক কাহিনী খাড়া করে থাকেন তাহলে তাকে অবৈজ্ঞানিক বলা হবে কেন ?

একথা অবশ্য সত্য যে, সেদিনকার ভারতীয় জ্যোতিষিগণ চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ জানতেন না। এইজন্য চন্দ্রের ক্ষয়রোগের কল্পনা। তাঁরা প্রত্যক্ষ করতেন চাঁদের কলা একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়। আবার পূর্ণিমার পর চাঁদের কলা হ্রাস পেতে আরম্ভ করে ; শেষে অমাবস্যার দিন একেবারেই দেখা যায় না। সঠিক ব্যাখ্যা করতে না পারায় গল্পের অবতারণা। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নয়, সে সময় অপর কোন দেশই চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। চন্দ্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে ভারতীয় পুরাণে।

ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ

ছেলেবেলায় শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে।

একবার গ্রামে শুভাগমন ঘটল এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের ধারে বটগাছের তলায় আসন পেতে বসলেন। গ্রামকে গ্রাম ভেঙ্গে পড়ল সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখতে। তার সুবৃহৎ জটা, পরনের বাঘছাল আর লম্বা ত্রিশূল দেখে সবাই ভাবলে খোদ হিমালয়ের সাধু গাঁয়ের পুণ্যফলে ছুটে এসেছেন এতদূরে। সাধুবাবার কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সকাল থেকে সেই যে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন তারপর খোলেন সেই সন্ধ্যায়। রাতে আগুন জ্বালিয়ে হোম করেন আর ভোরের দিকে মানুষের দুঃখের কথা শুনে বিধান দেন।

সহদেব ঘোষ গাঁয়ের ধনী লোক। বেড়ালের নাক তার। টাকার গন্ধ আপনি এসে ঢোকে। পয়সা-কড়ি যেখানে নেই সে পথ জীবনেও মাড়ায় না। গাঁয়ের লোক একদিন সবিস্ময়ে দেখল সর্বত্যাগী শ্মশানবাসী সাধুবাবার সব চেয়ে বড় সেবায়েৎ হয়ে উঠেছে সহদেব ঘোষ। বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময়, যে সহদেব ঘোষের হাত দিয়ে জলও পড়ে না সেই সহদেব ঘোষ সাধুর জন্য ক্ষীর-ননী-ছানার ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, দু-দিনে বটগাছের চারদিকে তুলে দিল পাকার পাঁচিল।

টাকার প্রতি বড় ভয় সাধুবাবার। হাত তুলে নেওয়া তো দূরের কথা, পয়সাকড়ি ট্যাকে গুঁজে কেউ এলেই শিউরে উঠেন। দৈবাৎ যদি কেউ কিছু দেবার জন্য সাধুবাবার পা-দুখানা জড়িয়ে ধরত তাহলে দূরে একটা মড়ার খুলিতে ফেলে দিয়ে যেতে বলতেন, কয়েকদিনের মধ্যেই খুলি উপচে টাকা-আধুলি-সিকি পড়ে যেত মাটিতে।

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার সময় অনেক কষ্টে সাধুবাবাকে বাড়িতে তুলল সহদেব ঘোষ ; যারা দেখল তারাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ভাগ্য বটে সহদেব ঘোষের ! সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারল না গাঁয়ের লোক। সকালে

তাদের ঘুম ভাঙ্গল সহদেব ঘোষের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে। কি হল? কি হল? ছেলে বুড়ো সবাই ছুটল সহদেবের বাড়ি। অবাক কাণ্ড! সহদেব কপালে করাঘাত করছে আর সাধুকে অভিশাপ দিচ্ছে! একটু পরে বুঝতে পারল সবাই। সহদেবের সেবাযত্নে তুষ্ট হয়ে সাধু তার একটা উপকার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বাড়িতে যদি রুপো থাকে তাহলে এনে দাও, সোনা করে দিচ্ছি।' ওষুধ ধরেছে বুঝে সহদেবের চোখগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠেছিল। তারপর গতকাল রাতে তাঁকে বাড়িতে এনে তাঁর সামনে থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছিল বাড়ির এবং যত বন্ধকী রুপোর গয়না, রুপোর বাসনপত্র এবং বহু কষ্টে সঞ্চিত পাঁচ-শ রুপোর টাকা। সাধু যখন রাত্রে ঘরের মধ্যে হোম করছিলেন তখনও জেগে বসেছিল সহদেব। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দোর খুলে দেখে সব ফাঁকা। সাধুও নেই, বাসনপত্র টাকাকড়ি কিছুই নেই। শ্মশানে ছুটে গিয়েছিল। সেখানে পড়ে আছে ত্রিশূল, বাঘছাল, এমনকি সেই লম্বা জটা মায় তাঁর গোঁফদাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু আসল মানুষটি অদৃশ্য। আর শ্মশান থেকে অদৃশ্য সেই মড়ার মাথার খুলিতে রাখা টাকা আধুলি আর সিকিগুলো। সহদেবের সামনে হা-হুতাশ করলেও তৃপ্ত হল সবাই। বাড়ি ফিরে এসে বেশ একচোট হেসে নিল গাঁয়ের লোক। টাকার লোভে সহদেবের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। বুদ্ধু আর কাকে বলে? রুপো কি কখনও সোনা হয়? সূর্য কি পশ্চিমে উঠতে পারে? না কি গাধাতেও গান গায়? যে শুনল সে-ই ধিক্কার দিল।

সোনার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ সেদিন টাকার কুমীর সহদেব ঘোষকেও পথে বসিয়েছিল। শোনা যায়, সেই আদি যুগ থেকে অর্থাৎ যে দিন থেকে মানুষ সোনার পরিচয় পেয়েছে সেই দিন থেকেই ঐ জিনিসটির প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করে আসছে। প্রাচীন ভারতে একদল তান্ত্রিক সাধুর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা লোহাকে সোনা বানাবার উপায় খুঁজতেন। এমন কি এটা ওটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন। সেইদিন থেকেই বোধ হয় মানুষের পরশমণির কল্পনা। পরশমণির কত গল্প আমরা শুনেছি এবং পড়েছি। সনাতনের গল্প, রুইদাসের গল্প, ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানর গল্প যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের স্বাদ এনে দেয়। আসলে পরশ পাথর নামে কোন পদার্থ কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না। কল্পিত কোন

অলীক পদার্থ যে অতি মাত্রায় প্রচারের ফলে সত্য বলে মানুষের দৃঢ়মূল ধারণা জন্মে তার একমাত্র প্রমাণ এই পরশ পাথর। সেকালের ভণ্ড সন্ন্যাসীরা এইভাবে মানুষের কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে গৃহস্থের সর্বনাশ করত।

কিন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছেন, যার দ্বারা রুপো তো দূরের কথা, লোহা তামা এমন কি এক টুকরো পাথরকেও সোনা বানাবার কল্পনা করেন। বর্তমান যুগে যদি কেউ বলেন যে তিনি রুপো কিংবা লোহাকে সোনায় পরিণত করে দিতে পারেন তাহলে তাঁকে আমরা ভণ্ড সন্ন্যাসী না বলে বলব পরমাণু বিজ্ঞানী। এখন দেখা যাক বিজ্ঞানীরা কেমন ধরনের পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন কোন পদার্থের পরমাণুকে ভাঙ্গলে কয়েকটি মৌলিক কণিকা পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে বিশেষ তিনটির নাম প্রোটন, ইলেক্ট্রন ও নিউট্রন। বিশ্বে যত মৌলিক পদার্থ আছে তাদের যে কোন একটিকে ভাঙ্গলে ঐ তিন রকমের কণিকা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যদিও পরিমাণে আছে যথেষ্ট তারতম্য। প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক তড়িৎকণা, ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক তড়িৎকণা এবং নিউট্রন নিস্তড়িৎকণা। প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও কোন কোন কণা পরমাণুর কেন্দ্রে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

পরমাণুর এই অংশটাকে বলা হয় কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের চারপাশে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়ায় ইলেক্ট্রনরা। সূর্যের চারপাশে যেমন গ্রহরা ঘুরে বেড়ায় ঠিক সেইভাবে কেন্দ্রকের চারপাশে ঘোরে ইলেক্ট্রন। কেন্দ্রে যতটা ধনাত্মক তড়িৎকণা প্রোটন থাকে, বাহিরে থাকে ততটা ঋণাত্মক তড়িৎকণা ইলেক্ট্রন। তাই বাহির থেকে পরমাণুকে তড়িৎনিরপেক্ষ মনে হয়। প্রত্যেকটি পরমাণুর ধর্ম নির্ভর করে মূলতঃ প্রোটন এবং ইলেক্ট্রনের সংখ্যার উপর। নিউট্রন কেবলমাত্র পরমাণুকে ভারী করে। প্রোটন নিউট্রন কেন্দ্রকের মধ্যে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে তাদের বিচ্যুত করা কিংবা অতিরিক্ত প্রোটন বা নিউট্রন যোগ করা বড় কষ্টকর। কিন্তু ইলেক্ট্রনগুলো কেন্দ্রকের বাহিরে আলতোভাবে লেগে থাকে বলে ওকে সরান খুবই সোজা। আবার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সমান যদি বাহিরে ইলেক্ট্রন না থাকে, তাহলে পদার্থের মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎগুণ প্রকাশ পাবে এবং বাহির থেকে যে কোন প্রকারে ইলেক্ট্রন সংগ্রহ করে তড়িৎনিরপেক্ষ হতে চেষ্টা করবে। প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেক্ট্রনের সংখ্যা

বিভিন্ন বলেই আমরা কোন পদার্থকে বলছি সোনা, কোনটিকে রূপা, কোনটিকে লোহা আবার কোনটিকে সাধারণ একটুকরা পাথর বলে থাকি। সোনার মধ্যে যত সংখ্যক প্রোটন ইলেক্‌ট্রন ও নিউট্রন থাকে লোহাতে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। এরা সোনা অপেক্ষা লোহাতে যত কম আছে ঠিক সেই পরিমাণ প্রোটন ও নিউট্রন যদি লোহার পরমাণুর কেন্দ্রতে প্রবিষ্ট করান যায় তাহলে সেটি আর লোহার পরমাণু থাকবে না, তৎক্ষনাৎ সোনার পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাবে।

পরমাণুর গঠনটা আবার অতি বিচিত্র। মাঝখানে কেন্দ্রক থাকে অতি অল্প স্থান জুড়ে। বাকী বিরাট অংশ ফাঁকা পড়ে থাকে। সেই ফাঁকা জায়গাতে ইলেক্‌ট্রন-গুলো দলে দলে ঘুরে বেড়ায় প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে। পরমাণুকে যদি একটা সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সূর্যটা তার কেন্দ্রক আর গ্রহগুলো ইলেক্‌ট্রন—মাঝে মাঝে প্রচুর ফাঁকা জায়গা। তফাত এই যে, গ্রহরা ঘোরে একটি একটি করে কিন্তু ইলেক্‌ট্রনরা ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে। তাদের প্রথম ঝাঁকে থাকে দুটি, দ্বিতীয় ঝাঁকে আটটি, তৃতীয় ঝাঁকে আটটি, চতুর্থ ঝাঁকে আঠারটি ইত্যাদি। ইলেক্‌ট্রনগুলো আবার ভয়নাক ঝগড়াটে। কারও যদি এগারটি ইলেক্‌ট্রন থাকে তাহলে প্রথম ঝাঁকে থাকবে দুটো, দ্বিতীয় ঝাঁকে থাকবে সেই আটটি, বাকী একটি আলাদা হয়ে ঘুরবে, কোন দল তাকে সঙ্গে নেবে না। পদার্থের পরমাণুর শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেক্‌ট্রনের কম থাকলেই পদার্থ হয় সক্রিয়, কারণ সে বাহিরের কোন পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আটটি ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাকে পূরণ করে নিতে চায়। পরমাণুর মধ্যে আবার এত ফাঁকা জায়গা আছে যে কল্পনা করতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কলকাতা শহরের সবচেয়ে যে বড় বাড়িটা আছে. তাতে যত ইট, লোহা, সিমেণ্ট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির পরমাণু থেকে যদি ফাঁকা জায়গাগুলো বাদ দেওয়া যেত, তাহলে বাড়িটা এক দেয়াশলাইএর বাক্সে পুরে ফেলা যেত। পরমাণু যদি গোলদীঘির মত বড় হত তাহলে কেন্দ্রকটা দেখাত দীঘির মাঝখানে ভেসে থাকা ছোট্ট একটি বেলফুলের কুঁড়ির মত। আর ইলেক্‌ট্রনদের তখনও দেখা যেত না। এবার অনুমান করতে অসুবিধা হবে না যে, পরমাণুর মধ্যে কত ফাঁকা জায়গা আছে! পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তাকে খালি চোখে তো দূরের কথা, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। শ্লেটে যদি চকখড়ি দিয়ে একটা দাগ কাটা যায় তাহলে যেটুকু চকের গুড়া শ্লেটে লেগে থাকবে তাতেই

থাকবে কোটি কোটি পরমাণু। অথচ এত যে ক্ষুদ্র পরমাণু, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে কেন্দ্রক এবং কেন্দ্রকের চারপাশে একরকম আলোকের গতি নিয়ে ঘুরছে ইলেক্‌ট্রনগুলো। আশ্চর্যের কথা নয় কি?

সত্যই বড় অদ্ভুত এই পরমাণুর রাজ্যটা। মানুষ এককালে ভাবত কোন পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকলে এমন একটা অবস্থায় আসবে যখন তাকে আর ভাঙ্গা যাবে না। পদার্থের সেই চরমতম অন্তিমকণা যাকে ভাঙ্গা যায় না তারই নাম দেওয়া হয়েছিল পরমাণু। পরমাণু সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রথমে খাড়া করেছিলেন জন ডালটন নামে এক বিজ্ঞানী। কিন্তু পদার্থের চরম কণিকার ধারণা ডালটনের পূর্বেও ছিল। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস, এমন কি তাঁরও বহু পূর্বে ভারতীয় ঋষি কণাদ পরমাণুতে বিশ্বাসী ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন উপনিষদের যুগেও ভারতীয় মনীষীরা পদার্থের চরম কণার কথা চিন্তা করেছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "পতত্র" নামে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকের মতে ঐ পতত্র শব্দটির অর্থ পরমাণু। পরবর্তীকালে পরমাণু সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে। বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদকে আরম্ভবাদ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিক দর্শনের প্রচারক মহর্ষি কণাদই পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা। কণাদের মতে পরমাণু অতি ক্ষুদ্র এবং সর্ববস্তুর মূল উপাদান। আরও বলা হয়েছে যে কোন বস্তুকে বিভাগ করতে করতে সর্বশেষে যে সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেই অবয়বহীন অংশই পরমাণু। আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী পরমাণুর মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বা গুণগুলি বজায় থাকে না। এমন কল্পনা ডালটনের ছিল না। তাঁর দেওয়া পরমাণুর সংজ্ঞা অনেকটা কণাদের মতই। তবে সর্ববস্তুর মূল উপাদান বলতে কণাদ কি বোঝাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে একটু সংশয় থেকে যায়। আজকের বিজ্ঞান সর্ববস্তুর মূল উপাদান হিসাবে ইলেক্‌ট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনকে ধরেন। তবে কণাদের কথা থেকে বোঝা যায় যে পরমাণুর মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান থাকে না—একেবারে আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের কথা। বুঝতে হবে ডালটন অপেক্ষা কণাদের চিন্তাধারা অধিক উন্নত। তাছাড়া কনাদ সর্ববস্তুর একটা মূল উপাদানের কথা চিন্তা করেছিলেন যা ডালটন করেন নি।

বৈশেষিক দর্শনের আর এক বিস্ময় দুটি পরমাণুর সংযোগের কল্পনা।

বলা হয়েছে—"ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় দুটি পরমাণুর সংযোগ করে থাকেন। তখন তার নাম হয় দ্ব্যণুক। তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন হয় ত্রসরেণু। পরমাণু ও দ্ব্যণুককে প্রত্যক্ষ করা যায় না।"

ডালটন প্রদত্ত পরমাণুতত্ত্ব একদিন সুধীমহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরের দিকে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর সূত্র অভ্রান্ত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক প্রতিপন্ন হলেও বহুক্ষেত্রে সূত্রের সত্যতা প্রমাণিত হল না। ইতালীয় বিজ্ঞানী আমদেও অ্যাভোগেড্রো অণুর কল্পনা করে পরমাণু বিজ্ঞানে প্রথম যুগান্তর আনয়ন করলেন। অ্যাভোগেড্রোই কল্পনা করেছিলেন, বস্তুকে বিভাগ করতে করতে এমন একটা জায়গায় পেঁছান যাবে যখন সেই ক্ষুদ্রাংশটির মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আর বেশী ভাঙ্গলে পদার্থের ধর্ম বজায় থাকবে না। যে অন্তিম কণাটির মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে সেই কণাটির নাম দিলেন অণু। অণুকে ভাঙ্গলেই হবে পরমাণু। পরমাণুর মধ্যে বস্তুর ধর্ম বজায় থাকে না। তিনি আরও বলেন, পরমাণু একক থাকতে পারে না, থাকে অণু হিসাবে। অ্যাভোগেড্রো অবশ্য আপন চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে তাঁরই এক সুযোগ্য ছাত্র ক্যানিজারো গুরুদেবের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করে জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের মতে পদার্থের স্বাধীন কণা পরমাণু নয় অণু।

ডালটনের 'পরমাণু' এবং অ্যাভোগেড্রোর 'অণু' ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের 'কণা ও 'দ্ব্যণুক'। সত্য কথা, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ স্থূল বস্তুরাশি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। ঈশ্বরকে জানার জন্য যতটুকু স্থূল বস্তুকে জানার প্রয়োজন হত কেবল ততটুকুই তাঁরা আলোচনা করেছেন। কণাদের মতে ঈশ্বর থেকে পরমাণু, পরমাণু থেকে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক থেকে ত্রসরেণু এবং ত্রসরেণু থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক দৃষ্টিগোচর না হলেও ত্রসরেণুকে দেখা যায়। কণাদের মতবাদ একটু পরিবর্তন করে নিলেই আধুনিক পরমাণু বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কণাদ কল্পিত ত্রসরেণু যৌগিক পদার্থ ছাড়া কিছু নয়। পরমাণু-বিজ্ঞানের মতে পরমাণু একক না থেকে থাকে অণু হিসাবে। তবে কতকগুলো মৌলিক পদার্থের পরমাণু অণুর মত আচরণ করে। যখন রাসায়নিক ক্রিয়া

সংঘটিত হয় তখন অণুর জোটবন্ধন খুলে যায়। বস্তু আসে পরমাণুর আকারে, তারপর একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে নতুন মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের অণু গঠন করে। কণাদের দর্শনে খোলাখুলিভাবে এসব কথা লেখা নেই বটে, তবে 'দ্ব্যণুক থেকে এসরেণু সৃষ্টি হয়' উক্তিটি রাসায়নিক ক্রিয়াই নির্দেশ করে। সে সময়ে পরমাণু সম্বন্ধে যদি ভালভাবে গবেষণা না হয়েছিল তাহলে দ্ব্যণুক ও এসরেণুর কল্পনা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? ডালটন ও অ্যাভোগেড্রোর হাজার হাজার বছর আগেকার বৈজ্ঞানিক তথ্যকে আজকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে চলবে না। ডালটনের পরমাণুবাদেও ভুল আছে এবং ভুল থাকা সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। মহর্ষি কণাদই বা সে দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন কেন?

দুর্ভাগ্য আমাদের! এমন সব মহান আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোন গুরুত্ব পেল না। দোষ আমাদেরও কম নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা যদি উদাসীন না থাকতাম, প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখতাম তাহলে পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা হিসাবে কণাদ জগৎপূজ্য হতেন। আরও একটি দোষ আছে আমাদের। যে পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রাচীন ভারতের পরিপন্থী ছিল পরবর্তী কালে সেই পাণ্ডিত্যই আসল বস্তুকে দূরে সরিয়ে ফেলল। পরের দিকে এমন কিছু কিছু ভাষ্যকার এবং টীকাকারদের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা প্রাচীনকালের মহান গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেবল পাণ্ডিত্যই জাহির করলেন। আসল তথ্যগুলির সঙ্গে কোন সংযোগই থাকল না। তাছাড়া প্রাচীনকালের ঋষিদের ছিল বহুমুখী জ্ঞান। একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে তাঁরা শাস্ত্র রচনা করতেন না। কিন্তু বহু টীকাকারদের জ্ঞানছিল সীমিত, হয়ত ভাষায় ছিলেন সুদক্ষ। ওঁদের ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট রইলাম, নিজেরা বিচার করলাম না। তাই কালের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে বহু আসল শাস্ত্র, কেবল টিকে আছে টীকা এবং ভাষ্য।

মহর্ষি কণাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় তিনি বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক একজন ঋষি। মহাভারত এবং কয়েকটি পুরাণে কণাদমতের আভাস ইতস্ততঃ ছড়ান আছে। কিন্তু আসল লোকটির সম্বন্ধে সবাই নীরব। দার্শনিক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি কণাদ, কণভক্ষ, কণভুক্, কশ্যপ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি কবে যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা যায় না। কেবলমাত্র ধরা যেতে পারে তিনি বৈদিক যুগের ঋষি এবং মহাভারত রচনার বহু পূর্বে তাঁর আবির্ভাবকাল। ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনও রচিত হয়েছিল সেই বৈদিক যুগে। দুঃখের বিষয় বৈশেষিক দর্শনের মূল সূত্রপাঠ এখন আর পাওয়া যায় না। বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গেছে। কণাদ দর্শনের সার সংগ্রহের মধ্যে প্রশস্তপাদের ধর্ম সংগ্রহই সুপ্রাচীন গ্রন্থ। বাংলাদেশে শ্রীধর নামে জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত কণাদের বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর ন্যায়-কন্দলী গ্রন্থখানি আজও প্রচলিত। কণাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানা গেলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পদার্থকে বিশ্লেষণ করার প্রথম প্রয়াস একমাত্র কণাদদর্শনে পাওয়া যায়। যদিও বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে পরমাণু, আত্মা, ঈশ্বর, আকাশ সবাইকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে।

পরমাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আজ যা জানতে পেরেছি তার ইতিহাস অতি অল্প দিনের! ক্যাথড্ রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণা, রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কার, রাদারফোর্ডের পরীক্ষা, কুরি দম্পতির তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে প্রমাণ করা হল যে পরমাণু ঠাসা, নিরেট বা অবিভাজ্য কণা নয়। তাকে ভাঙ্গা যায় আবার গড়াও যায়। এক মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে অপর মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত করা যায়। আজকের পরমাণু বিজ্ঞান সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠেছে উপরে। একদিন যা ছিল মানুষের কল্পনা আজ পরমাণু বিজ্ঞান তাকে বাস্তবে পরিণত করেছে। তা সত্ত্বেও ডালটনের পরমাণুবাদের গুরুত্ব আদৌ হ্রাস পাবে না। কিন্তু একই তথ্য ভারত প্রচার করেছিল ডালটনের কয়েক হাজার বছর আগে তবুও সে তথ্য গুরুত্ব পায়নি বিজ্ঞানে। আমরাই কণাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছি।

মহাভারতের কথা

মহাভারতে এমন অনেক কাহিনী আছে যেগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় সে যুগের উন্নত আবিষ্ককারের বৈজ্ঞানিক কথা। সব কাহিনীর আলোচনা করতে গেলে দ্বিতীয় একটি মহাভারতের সৃষ্টি হবে। আবার সব কাহিনী সবার কাছে বাস্তব বলে মনে নাও হতে পারে। কেউ কেউ সেগুলিকে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে অভিযোগ করতে পারেন। যেমন একটি কাহিনী সঞ্জয়ের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শনের কথা। মহামুনি বেদব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন বলে মহাভারতে কথিত আছে। ব্যাসদেবের দিব্যচক্ষু দূরবীক্ষণ যন্ত্র হওয়াও বিচিত্র নয়। যযাতির জরা পরিত্যাগ ও যৌবন গ্রহণ উন্নত অধিরোপণ প্রণালীও হতে পারে। এই সব কাহিনীর মূলে সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন আসে। তাই এগুলি পরিত্যাগ করে যেখানে শুদ্ধ বিজ্ঞানের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তারই দু-একটি উল্লেখ করা হল।

(১) জতুগৃহ দাহ।

মহাভারতে জতুগৃহ দাহের কথা সবার পরিচিত। ঈর্ষ্যাপরায়ণ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে অগ্নিদগ্ধ করে গোপনে হত্যা করার জন্য বারণাবতে প্রেরণ করেছিলেন। দুর্যোধনের আশ্রিত পুরোচন নামে এক ম্লেচ্ছ শিল্পী পূর্ব থেকে সেখানে নির্মাণ করেছিলেন এক সুরম্য প্রাসাদ। পাণ্ডুপুত্রদের এবং মা কুন্তী দেবীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন স্বয়ং পুরোচন। তৎ-নির্মিত প্রাসাদটি যে অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ এবং সুদৃশ্য হয়েছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই এবং পুরোচনের যে পদমর্যাদা যথেষ্ট ছিল তাও সহজে অনুমান করা যায়।

কিন্তু প্রাসাদটি সাধারণ ইট,কাঠ, পাথর দিয়ে প্রস্তুত ছিল না। এর উপাদান ছিল লাক্ষা জাতীয় জিনিস (জতু), ঘৃত প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ। মহাভারতে অবহেলিত সেই ম্লেছ শিল্পী পুরোচনের কৃতিত্ব কিন্তু অসাধারণ। তিনি লাক্ষা ব্যবহার করতে পারতেন এবং প্রাসাদ নির্মাণে তাঁর জুড়ি বড় একটা কেউ ছিল না। তা না হলে দুর্যোধনের মত এত বড় অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান সম্রাট পুরোচনকেই বা কেন নিয়োগ করলেন।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও আর একটি কথা বলতে হয়। আর্যরা প্রাসাদ নির্মাণে দক্ষ ছিলেন না। আর্যদের আগে এদেশে এক রকমের নগর সভ্যতার প্রচলন ছিল। সেই সভ্যতাই ভারতের আদি সভ্যতা। পৌরবিজ্ঞান এবং স্থাপত্য শিল্পে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তাঁদের নির্মিত প্রাসাদ আর্যদেরও অভিভূত করেছিল, যদিও সেই আদি ভারতবাসীদের আর্যরা সুনজরে দেখতেন না। তাঁদের সাহিত্যে এঁরা ম্লেচ্ছ, অনার্য, অসুর প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। তবুও কিছু কিছু পরাক্রমশালী আর্যরাজা প্রতিভাবান অনার্য (?) শিল্পীদের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন আপন প্রাসাদ নির্মাণের কাজে। পুরোচন এই ধরনের এক শিল্পী। শ্রীকৃষ্ণও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা নির্মাণের জন্য নিয়োগ করেছিলেন ময়দানবকে।

দুর্যোধনের পুরোচন কেবলমাত্র অট্টালিকা নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, রসায়ন জ্ঞানও তাঁর কম ছিল না। মহাভারতে পুরোচন অবহেলিত। একদিকে পুরোচন অনার্য, অপরদিকে তিনি দুর্যোধনের সহযোগী। ধার্মিক পাণ্ডুপুত্রদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থকার তাঁর দুর্নাম করলেও মহৎ গুণটি উল্লেখ করে গেছেন, যদিও অতীব ঘৃণাসহকারে। গ্রন্থকারের ক্রোধ ছিল তাঁর প্রতি অপরিসীম, শেষে দেখি পুত্রগণসহ পুরোচনকেই পুড়িয়ে মেরে ফেলে নিঃশ্বাস ফেলেছেন : আর যুধিষ্ঠিরাদিকে সুড়ঙ্গ পথে চালান করে দিয়েছেন। এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন মহামতি বিদুর। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য। কুরুরাজসভায় তাঁর ছিল ঘন ঘন যাতায়াত এবং ধনীও তিনি ছিলেন নিশ্চিত। তাই তাঁরই প্রেরিত লোকজন গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে রাত্রির অন্ধকারে হাজির করল এক নদীতীরে। তাঁদের পথ দেখিয়ে যে লোকটি নিয়ে গেছল সে অদূরে একটি নৌকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল —

"সর্ব বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।"

অর্থাৎ এই নৌকা সর্ববিধ বায়ুসহ, যন্ত্রযুক্ত এবং পতাকাযুক্ত। সে আরও বলেছিল —"আপনাদের আর কোন ভয় নেই। মহাত্মা বিদুর প্রেরিত এই নৌকায় আরোহণ করুন। অতি অল্প সময়ে আপনাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে।"

এই নৌকাটি খুব বড় ছিল না। তবে এখানে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে মহাভারতীয় যুগে নৌকাকে যন্ত্রযুক্ত করা হত। মামুলী হাল, দাঁড় এবং

পালের দ্বারা নৌকা চললেও ধনীরা যন্ত্রযুক্ত জলযান ব্যবহার করতেন। সে যুগে যন্ত্রশিল্প ছিল না একথা একেবারেই ভুল। স্থলেও যন্ত্রযুক্ত গাড়ি ব্যবহার করা হত। তখন রথের প্রচলন থাকলেও দূরদেশে যন্ত্রযানে আরোহণ করে যাওয়া হত। যদিও সে সব জলযান এবং স্থলযান রাজা-রাজড়া ছাড়া সাধারণে ব্যবহার করত না।

কথিত আছে, একবার ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজসভা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিদুরকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর আর এক সচিব সঞ্জয়কে প্রেরণ করেছিলেন। বিদুর সে সময় ছিলেন যুধিষ্ঠিরদের কাছে। হস্তিনাপুর থেকে তিন দিন তিন রাত্রির পথ। সঞ্জয় বিশেষ একটি স্থলযানে আরোহণ করে মাত্র একদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেছলেন সেখানে। সেই যানটি কোন রথও ছিল না, আবার বিমানও ছিল না। বর্তমানের মোটর গাড়ি জাতীয় কোন জিনিস হতে পারে।

(২) ভীষ্মের শরশয্যা।

ন' দিন ধরে তুমুল যুদ্ধের পরও পিতামহ ভীষ্ম এতটুকু কাবু হলেন না। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁর কাছে হার মানতে হল। বাধ্য হয়ে দশম দিনের যুদ্ধে চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন হাজির করলেন শিখণ্ডীকে। এই শিখণ্ডী ছিলেন দ্রুপদ রাজকন্যা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দেখেই ঘৃণায় অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন পিতামহ। শ্রীকৃষ্ণের অনুমান সত্য হল। অর্জুন বাণে বাণে জর্জরিত করলেন ভীষ্মদেবকে। শেষে শরশয্যা গ্রহণ করলেন পিতামহ। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা পিতামহকে শেষ দেখা দেখতে এলেন। এক সময় ভীষ্মদেব চাইলেন তৃষ্ণার জল। দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ আনিয়ে দিলেন সুবর্ণ ভৃঙ্গারে সুরক্ষিত সুবাসিত পানীয়। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্মদেব শেষ সময়ে পার্থিব বস্তু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অর্জুন তখন গাণ্ডীবে শর যোজনা করে নিক্ষেপ করলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল স্বচ্ছ জলধারা পৃথিবীর মাটি ভেদ করে। সেই জল পান করে পরম পরিতৃপ্ত বোধ করলেন ভীষ্মদেব।

ভূগর্ভে জলের উপস্থিতির কথা সে যুগে অজানা ছিল না। মনে হয় উত্তোলন করা ছিল কষ্টসাধ্য। তবে কেউ কেউ যে পারতেন না এমন নয়।

* * * *

ভীষ্মদেব পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন ইচ্ছামৃত্যু বর। যখন তিনি শরশয্যা গ্রহণ করেন তখন চলছিল সূর্যের দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নে মৃত্যু শুভ নয় মনে করে উত্তরায়ণে দেহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করলেন ভীষ্মদেব। শরশয্যার দিন থেকে আটান্নটি রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর উত্তরায়ণে শুভ মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে তাঁর দেহান্তর হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ধারণা, মাস, তিথি, নক্ষত্র গণনা সবই প্রচলিত ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে।

(৩) কশ্যপমুনির কথা।

ভারতে বিষধর সর্পের অভাব নেই। প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে সর্পদংশনে। সাপের প্রতি মানুষের ভীতি তাই আদি যুগ থেকে। সেদিন থেকেই মানুষ প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করতে যত্নবান। আধুনিক উন্নত চিকিৎসা প্রণালীর কৃপায় সর্পদংশনে মৃত্যুর হার কিছুটা কমেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন সিরাম। দংশনমাত্র ক্ষতস্থানের উপর ভালভাবে বন্ধনী দিয়ে অবিলম্বে চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দিলে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা অনেকটা কমে যায়।

প্রাচীন ভারতেও এক ধরনের বিষ চিকিৎসার প্রচলন ছিল। যে সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় ক্ষতস্থান বন্ধনের রীতি তখনও প্রচলিত ছিল। রোগীকে ঘুমোতে দেওয়া হত না, সিরামের বদলে বিষঘ্ন তীব্র ওষুধ প্রয়োগ করা হত। সর্পবিষ চিকিৎসার জন্য পুরাকালে একদল ওঝারও আবির্ভাব হয়েছিল এবং বর্তমানেও তাদের অভাব নেই। কিন্তু সেকালেও চিকিৎসকগণ এমন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রণালীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিষ চিকিৎসার যেসব প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গেছে তাতে মন্ত্রতন্ত্রের কথা আদৌ নেই। বিজ্ঞানসম্মত বিষ চিকিৎসা সেকালে অগদতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র সর্পবিষ নয়, ক্ষ্যাপা কুকুর-শেয়ালের দন্তবিষের চিকিৎসাও অগদতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অগদতন্ত্র আয়ুর্বেদের একটি শাখা বিশেষ, এমন কি চরকেও এর উল্লেখ আছে। চক্রপাণি দত্ত, শ্রীকণ্ঠ প্রমুখ টীকাকারগণ সর্পবিষ চিকিৎসার উপায় বর্ণনা করে গেছেন। কেউ কেউ আবার অগদতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে অগদতন্ত্র সম্বন্ধীয় পৃথক পুস্তকও রচনা করে গেছেন। সেই পুস্তকগুলির মধ্যে কাশ্যপসংহিতা ও সনকসংহিতা প্রধান। পুস্তক দুখানি চরক সংহিতার অনেক পূর্বে রচিত হয়েছে। একখানির রচয়িতা কশ্যপ মুনি, অপরখানির রচয়িতা সনক মুনি। সনক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু কশ্যপ সম্বন্ধে একটি গল্প মহাভারতে পাওয়া যায়।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ বনমধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে হঠাৎ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গের লোকজনদের ফেলে এগিয়ে গেলেন পানীয় জলের খোঁজে। এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক সময় তাঁর দৃষ্টিগোচর হল এক ঋষির আশ্রম। হৃষ্টমনে এগিয়ে গেলেন রাজা আশ্রমকুটীরে। কুটীরের দ্বারদেশে দেখতে পেলেন এক মৌনী ঋষিকে। রাজা উচ্চকণ্ঠে বারবার আবেদন জানালেন একটু পানীয় জলের জন্য, তবুও ধ্যান ভঙ্গ হল না ঋষির। বিরক্ত হলেন রাজা মনে মনে। দেশের রাজা তিনি। তাঁকে সম্মান জানান তো দূরের কথা, ঐ ঋষি তাঁর সঙ্গে কথাও বলছেন না। ভাবলেন ব্রাহ্মণকে একটু অপমান করে চরম শাস্তি প্রদান করবেন। দেখতে পেলেন অদূরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। ধনুকের প্রান্তভাগ দিয়ে সেটিকে তুলে জড়িয়ে দিলেন ঋষির গলায়। ঋষি কিন্তু একটুও বুঝতে পারলেন না।

এই ঋষির নাম শমীক। পুত্র শৃঙ্গীসহ বনে বাস করতেন। সেদিন শৃঙ্গীও ছিলেন না কুটীরে। কিছুক্ষণ আগে বনে গেছলেন ফল-মূল আহরণের জন্য। ফিরে এসে দেখলেন পিতার গলায় জড়ান সাপের খোলস। ক্রুদ্ধ শৃঙ্গী অভিশাপ দিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর পিতাকে এমন চরম অপমান করে গেছে, সে সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক দংশনে প্রাণ হারাবে। ধ্যানভঙ্গের পর পুত্রের মুখ থেকে সব কথা শুনে পুনরায় শমীক ধ্যানস্থ হলেন। বুঝতে পারলেন সব কথা। বিমর্ষ হয়ে পুত্রকে ভর্ৎসনা করতে করতে ছুটে এলেন পরীক্ষিতের কাছে। কিন্তু ব্রহ্মশাপ তো ব্যর্থ হবার নয়, কী হবে তাহলে?

রাজা সাবধান লেন। রাজ্যমধ্যে প্রচার করা হল—"কে আছ রাজার

হিতৈষী ?· ছুটে এস রাজার প্রাণ বাঁচাতে।" ছ' ছ'টি দিন কেটে গেল। আর মাত্র একদিন যদি রাজা প্রাণে বেঁচে থাকেন তাহলে ব্যর্থ হবে ঋষি-পুত্রের অভিশাপ।

এদিকে সাতদিনের দিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তক্ষক চলেছেন রাজাকে দংশন করতে। রাস্তায় দেখা হল আর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন রাজবাড়ির দিকে। কৌতূহলী তক্ষক জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে তুমি ব্রাহ্মণ ? রাজবাড়ির দিকে চলেছ কোন অভিপ্রায়ে ?

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেনঃ আমি সর্পবিষ বিশেষজ্ঞ কশ্যপ। শুনেছি তক্ষক দংশনে রাজা প্রাণ হারাবেন। আমি রাজার বিষজ্বালা নিবারণ করে তাঁকে পুনর্জীবিত করব।

চোখ কপালে তুললেন তক্ষক। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেনঃ তুমি জান না ব্রাহ্মণ, তক্ষকের বিষ কত ভয়ানক।

দৃঢ়স্বরে বললেন ব্রাহ্মণ : তুমি কশ্যপকে চেনো না বলেই বলছ। চল রাজ-সভায়, যদি তক্ষক আজ রাজাকে দংশন করে তাহলে অবশ্যই পরিচয় পাবে আমার বিদ্যার।

কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না তক্ষক। অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেনঃ কেন মূর্খের মত রাজসভায় গিয়ে অপমানিত হবে ব্রাহ্মণ! তার চেয়ে ঘরেই ফিরে যাও।

এবার মেরুদণ্ডটা সোজা করে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণ। আত্মসম্মানে ঘা পড়ল তাঁর। তক্ষকের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ না; রাজাকে বিষমুক্ত না করে কিছুতেই ফিরে যাব না আমি।

ব্রাহ্মণের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর শুনে অবাক হলেন তক্ষক। পরক্ষণে ভাবলেন, এই ব্রাহ্মণ নিজ বিদ্যার অহংকারে মত্ত হয়ে তক্ষকের বিষকেও তুচ্ছ করতে চাইছে। নিজেই অপমান বোধ করলেন তক্ষক। ব্রাহ্মণকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে বললেনঃ শোন ব্রাহ্মণ! আমিই সেই তীব্র বিষধর তক্ষক। চলেছি রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করতে। একটু পরেই তোমাদের মহান্ রাজা পরীক্ষিৎ বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে লুটিয়ে পড়বেন মাটিতে। তার আগে আমি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা করতে চাই।

ঃ উত্তম। একটুও দমলেন না কশ্যপ। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ তুমি যাকে খুশী দংশন করতে পার। মুহূর্ত মধ্যেই আমি তাকে সারিয়ে তুলব।

তক্ষক কালবিলম্ব না করে পথের ধারে একটা বৃহৎ গাছের বাকলে বসিয়ে দিলেন দাঁত। কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শুকিয়ে গেল গাছটা, যেন কয়েক মুঠো ভস্মে পরিণত হয়ে গেল! আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে, অবজ্ঞার সুরে বললেন তক্ষক ঃ হে দাম্ভিক ব্রাহ্মণ! এখনও কি তোমার বিদ্যার পরিচয় দিতে চাও?

একটুও বিচলিত হলেন না ব্রাহ্মণ! মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন গাছের দিকে। তারপর কি সব করলেন। ধীরে ধীরে গাছটাও পুনর্জীবন লাভ করল। শিউরে উঠলেন তক্ষক। সামান্য মানুষ এত শক্তিধর? যার বিষকে স্বয়ং দেবতারাও ভয় করেন—আর এই তুচ্ছ মানুষ·····! সত্যই কলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে ধরাধামে। এবার থেকে তক্ষক হবে বিষহীন—ব্রহ্মশাপ হবে ব্যর্থ। রীতিমত বিচলিত হলেন তক্ষক; অনুনয় ফুটে উঠল তাঁর মুখে। হাত জোড় করে বললেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি বিস্মিত হয়েছি তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে। কিন্তু একটি কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; তুমি নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ করো না। মরতে দাও রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষকদংশনে।

ব্রাহ্মণ এবার মুষড়ে পড়লেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন ঃ আমাকে এমন অনুরোধ করবেন না তক্ষক। আমি বড় দরিদ্র। আজ রাজাকে যদি সুস্থ করে তুলতে পারি তাহলে আমার অন্নকষ্টের অভাব চিরতরে দূর হয়ে যাবে। তক্ষক কিছুক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন তারজন্য চিন্তা করো না ব্রাহ্মণ। আমি তোমায় দিচ্ছি প্রচুর ধনরত্ন— যা রাজার রাজভাণ্ডারেও নেই। সেই অর্থ নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে যাও আর ব্রহ্মশাপকে সার্থক হতে দাও।

ব্রাহ্মণ একটু আনমনা হয়ে পড়লেন। ভাবলেন রাজবাড়িতে যাওয়া তাঁর উচিত হবে কি না। চিকিৎসক তিনি কেমন করেই বা ফিরে যাবেন রোগীকে না দেখে।

তক্ষক যেন তাঁর মনের কথা টের পেলেন। হেসে বললেন ঃ বিধির অমোঘ বিধানে পরীক্ষিতের মৃত্যু আজ অবশ্যই হবে। বিধিলিপি খণ্ডন করার সাধ্য কারও নেই। শৃঙ্গীর অভিশাপ একটা নিমিত্তমাত্র। আর তা না হলে তোমার সঙ্গেই বা আমার দেখা হয়ে যাবে কেন ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ অনেক চিন্তা করে তক্ষকের দেওয়া অমূল্য রত্নরাজি নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে তক্ষকও চললেন রাজাকে দংশন করতে।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণই কশ্যপ মুনি। কাহিনীটির সত্যতা যাচাই করা নিরর্থক। তবে কশ্যপ মুনি কাল্পনিক চরিত্র নয়। লেখক কশ্যপের চিকিৎসা নৈপুণ্যের কথা জানতেন। তাই কাহিনীর মধ্যে কশ্যপকে টেনে আনার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। কশ্যপের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীলও। কিন্তু রাজবাড়িতে কশ্যপকে হাজির করলে পরীক্ষিতের মরা হত না। ব্রহ্মশাপ হয়ে যেত একেবারে ব্যর্থ। কাহিনীটির মধ্যে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে তাহলে লুপ্ত হয়ে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করত। পরীক্ষিতের মৃত্যু না হলে মহাকাব্যেরও অংগহানি ঘটত। তাই যেমন সুকৌশলে লেখক কশ্যপকে হাজির করেছেন, তেমনই তাঁর বিদ্যাবত্তা জাহির করে কৌশলেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, কাহিনীর গতি একেবারেই রুদ্ধ হয়নি।

এই কশ্যপ বেদোক্ত মহর্ষি কশ্যপ থেকে ভিন্ন। মহর্ষি কশ্যপ, দিতি-অদিতি তাঁর পত্নী, দেবতা এবং অসুরদের পিতা। এখানকার কশ্যপ মর্তের এক সাধারণ মানুষ—সর্পবিষ বিশেষজ্ঞ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অনেকে মনে করেন পরীক্ষিৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কশ্যপমুনিও মিথ্যা নয়। তাঁর লেখা কশ্যপসংহিতা দীর্ঘকাল ধরে ভারতে প্রচলিত ছিল। টীকাকারদের মতে কশ্যপসংহিতা একাধারে কায় চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা ও অগদ-তন্ত্রের শাস্ত্র। সংহিতাখানি বৈদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে কশ্যপের পরবর্তীকালে রচিত মহর্ষি শৌনিক প্রণীত শৌনিকসংহিতা আরবীয়রা এককালে অনুবাদ করেছিলেন। অনূদিত শৌনিক সংহিতার একখানি জীর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত "মুলার" আবিষ্কার করেছিলেন।

মহাভারতের লেখক কশ্যপ ও পরীক্ষিতকে সমসাময়িক বলে বর্ণনা করেছেন। কশ্যপের আবির্ভাব কাল হিসেব করতে গেলে পরীক্ষিতের সময়কাল হিসেব করতে হয়। ভারতীয় জ্যোতিষীদের মতে পরীক্ষিতের জন্ম থেকে কলিযুগ আরম্ভ। সেদিনের সেই সাপের খোলসটি ছিল ছদ্মবেশী কলি। সে যাই হোক না কেন জ্যোতিষীদের মতে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে। আধুনিক গবেষকগণ পরীক্ষিতকে এত প্রাচীন বলে মনে করেন না। গবেষকগণের অনেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথাও বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু স্বীকার করেন ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় এ'রা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁদের মত এই যে, একমাত্র মহাভারত ছাড়া পাণ্ডু এবং তাঁর পুত্রগণ, ভীষ্ম-কর্ণ, প্রভৃতি যোদ্ধৃগণের নামোল্লেখ অন্য কোন পুরাণ বা উপপুরাণে নেই। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পরীক্ষিৎদের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে বহু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা অনেক পুরাণে পাওয়া যায় কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা একমাত্র মহাভারত ছাড়া অন্য কোন পুরাণকার উল্লেখ করেননি। সেইজন্য তাঁদের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনৈতিহাসিক ঘটনা হলেও ধৃতরাষ্ট্র-পরীক্ষিৎ ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

পরীক্ষিতের সময় তাঁরা নিম্নরূপে গণনা করেছেন, এবং সে গণনার উৎসও পুরাণ। একাধিক পুরাণে কুরুবংশলতার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। তাতে দেওয়া হয়েছে প্রথম রাজা বৈবস্বত মনু থেকে শেষ রাজা ক্ষেমকের নাম। এ'দের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। নিচক্ষু নামক রাজার আমলে গঙ্গার বন্যায় হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হলে রাজা কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কৌশাম্বী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরী। ভগবান বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন উদয়ন। কুরুবংশলতায়ও উদয়নের স্থান আছে। বর্ণনা করা হয়েছে, উদয়ন শেষ রাজা ক্ষেমকের পূর্ববর্তী চতুর্থ পুরুষ। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় উদয়নের মৃত্যুর অনেক পরে কৌশাম্বী অবন্তিরাজাদের হস্তগত হয়। পুরাণ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ বড় একটা নেই। বংশলতাকে যদি স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে পরীক্ষিৎদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেও স্বীকার করতে হবে। এই পরীক্ষিৎ আবার উদয়নের উর্ধ্বতন ২৪তম নরপতি। চব্বিশ জন রাজার রাজত্বকাল পাঁচশ বছরের অধিককাল হওয়া সম্ভব নয়। তাই কশ্যপ এবং পরীক্ষিৎ খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রও তাই বলা যেতে পারে খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ হাজার বছর আগে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

চক্ষু উৎপাটন ও অধিরোপণের একটি গল্প

প্রাচীন ভারতের উন্নত শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রও নীরব নয়। বরং তাঁদের বর্ণনা হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা বেশী নিখুঁত ও বিজ্ঞান-সম্মত। একটি কাহিনী এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হল।

পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। নাম তাঁর শিবিকুমার। অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীল রাজা। তাঁর দানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ বিদেশে। কত দূর দেশ থেকে আসত কত অনাথ-আতুর, কত দীন-দরিদ্র আসত তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে। রাজা বিমুখ করতেন না কাউকে। সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেন দরিদ্রের কল্যাণে।

স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের কানে গেল কথাটা। ভাবলেন তিনি, শিবিকুমার যে কত বড় দাতা একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অশীতিপর বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি একদিন হাজির হলেন শিবিকুমারের সভায়। রাজা রাজসিংহাসনে বসে আছেন রাজাসভা আলো করে। পাত্র-মিত্র সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কেবল শিবিকুমার প্রার্থীদের আবেদন শুনছেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন প্রার্থীদের দেখে।

এক সময় প্রার্থীরা একে একে বিদায় নেওয়ার পর লাঠিতে ভর দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়ালেন ইন্দ্রদেব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে রাজা শিবিকুমার তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর পরমযত্নে তাঁকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আগমনের অভিপ্রায়।

কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন বৃদ্ধঃ মহারাজ! আমি অন্ধ ও জরাগ্রস্ত, যৎকিঞ্চিৎ দানের প্রত্যাশা নিয়ে বহুদূর থেকে অতিকষ্টে এসেছি আপনার কাছে। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন রাজা। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেনঃ বলুন ব্রাহ্মণ, কী অভিপ্রায় আপনার? আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনার কষ্ট লাঘব করতে।

ব্রাহ্মণ একবার মুখ তুলে তাকালেন রাজার দিকে। চোখে তাঁর দৃষ্টিশক্তি

আছে বলে মনে হল না। ঘোলাটে চক্ষুদ্বয় থেকে ঝরে পড়েছে অবিরল অশ্রুধারা। রাজার চোখেও জল এল। পরম মমতাভরে ব্রাহ্মণের হাত দুটি ধরে অনুরোধ জানালেন : রাজবাড়ির দ্বার আপনার কাছে চির-উন্মুক্ত ব্রাহ্মণ ; যতদিন খুশি বাস করুন এখানে, পরিচর্যার কোন ত্রুটি হবে না।

ব্রাহ্মণ বললেন : আমি তো একা নই রাজা, আমারও স্ত্রী পুত্র আছে, আমার অনুপস্থিতিতে তাদের কেমন করে চলবে ?

রাজা কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে বললেন : আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখনই তাদের ভার গ্রহণ করলাম। ব্রাহ্মণ হাসলেন। মৃদুস্বরে বললেন : আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত। কিন্তু এ দান গ্রহণ করতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত।

: তাহলে কি চান এবার খুলে বলুন ব্রাহ্মণ! জিজ্ঞাসা করলেন রাজা শিবিকুমার। ব্রাহ্মণ এবার বললেন : আগে কথা দাও, আমি যা চাইব তাই প্রদান করবে ?

বিস্মিত রাজা একবার তাকালেন ব্রাহ্মণের দিকে। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : আমি কথা দিচ্ছি ব্রাহ্মণ, যত কঠিন হোক না কেন আপনার প্রার্থনা, আমি পূর্ণ করবই।

রাজার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ। শান্ত ও সংযত সুরে বললেন : আমি ব্রাহ্মণ, অন্ধত্বের জন্য বেদপাঠ এবং ধর্মশাস্ত্রাদি চর্চা আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব হে রাজন! আপনার নীলপদ্মের মত সুন্দর চোখ দুটি দান করে আমায় চক্ষুষ্মান করুন।

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজসভা। বিস্মিত পাত্র-মিত্র তাকালেন ব্রাহ্মণের দিকে, হাতের কাজ হাতেই রইল। ভাবলেন মনে মনে কে এই ব্রাহ্মণ? জগতের এত প্রার্থনার বস্তু থাকা সত্ত্বেও রাজার চোখদুটির প্রতি লোভ কেন। রাজা কিন্তু কিছু মনে করলেন না। হেসে বললেন : এই সামান্য একটি জিনিসের জন্য আপনার এত কুণ্ঠা কেন? আমি এখনই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করছি।

কালবিলম্ব না করে শিবিকুমার ডেকে পাঠালেন রাজবৈদ্য সীবককে। সীবক সব কথা শুনে একেবারে কেঁদেই ফেললেন। সমস্ত রাজবাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু নির্বিকার শিবিকুমার সীবককে আদেশ করলেন : হে রাজ-

বৈদ্য! জীবনে এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আসে না। অতি সত্বর আমার চোখ দুটি উৎপাটন করে স্থাপন কর বৃদ্ধের অক্ষিগহ্বরে।

কাঁদতে কাঁদতে সীবক বললেনঃ এমন ভয়ঙ্কর দান থেকে বিরত হোন সম্রাট। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও কেউ চক্ষু দান করে না। চক্ষুহীন হয়ে বেঁচে থাকা যে কী বিড়ম্বনা! রাজার মনোভাবের এতটুকু পরিবর্তন হল না। পুনঃ পুনঃ আদেশ করতে লাগলেন সীবককে চক্ষু উৎপাটনের জন্য। অবশেষে রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য করে, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা প্রাণপণে চেপে, উদ্গত অশ্রুবেগ যথাসাধ্য সংবরণ করে রাজার চোখে অস্ত্রোপচার করলেন সীবক। একসময় একটা প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম রাজার চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কি ফুলটিকে দেখতে পাচ্ছেন মহারাজ?

রাজা বললেনঃ হ্যাঁ; পাচ্ছি।

সীবক বললেনঃ আর একটি মাত্র প্রধান শিরা আছে। ঐটি কেটে দিলেই আপনা হতে বেরিয়ে আসবে অক্ষিগোলক। এখনও সময় আছে চিন্তা করে বলুন সম্রাট। আমি চক্ষু উৎপাটনে বিরত হই।

বিরক্ত হলেন রাজা। ভর্ৎসনার সুরে বললেনঃ আর কেন কালক্ষয় করছ সীবক। আমার চক্ষুর বিনিময়ে ঐ বৃদ্ধই ফিরে পাক তাঁর দৃষ্টিশক্তি, চোখের প্রয়োজন আমার চেয়ে তাঁর অনেক বেশী।

সীবকের দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামল। তথাপি এক সময় ছিন্ন করতে হল চোখের প্রধান শিরাকে। তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দৃষ্টিহীন চক্ষুগোলক দুটির পরিবর্তে স্থাপন করলেন রাজার দেওয়া চোখ দুটি। মুহূর্তে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন ব্রাহ্মণ আর রাজা শিবিকুমারের চোখ থেকে চিরদিনের জন্য মুছে গেল পৃথিবীর আলো। স্বর্গ থেকে দেবতারাও ধন্য ধন্য করে উঠলেন।

গল্পটির সত্যতা যাচাই করা অভিপ্রেত নয়। এখানে সীবকের চক্ষু উৎপাটন প্রণালীটিই অনুধাবন করার মত। প্রাচীন ভারতে চক্ষু উৎপাটন এবং পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা যদি জানা না ছিল তাহলে গল্পলেখক এত সুন্দর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়টি বর্ণনা করলেন কীভাবে? আজও কী এই একই উপায়ে চক্ষু সংগ্রহ করা হয় না? চক্ষু যে একটিমাত্র প্রধান শিরার সঙ্গে যুক্ত একথাও তৎকালে সাধারণের জানা ছিল। আজকাল চক্ষু সংগ্রহ করে চক্ষু ব্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা হয়। পরে সুবিধামত কোন চক্ষুহীনের অক্ষিগহ্বরে স্থাপন করা

হয়। সেকালে চক্ষু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। চিকিৎসকগণ তৎপরতার সঙ্গে এই কাজ সম্পাদন করতেন। এখনকার মত তখনও জানা ছিল চক্ষু উৎপাটনের পর কিংবা মানুষের মৃত্যুর পরও কিছুক্ষণ যাবৎ চক্ষু সক্রিয় থাকে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন অন্ধের চক্ষুগহ্বরে প্রধান শিরার সঙ্গে সুস্থ চোখ জুড়ে দিতে পারলে অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে। চক্ষু অধিরোপণ পদ্ধতি প্রায় হাজার বছর আগে ভারতে প্রচলিত ছিল, তার পরেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ যাঁরা গল্পের পরিসমাপ্তি জানতে চান তাঁদের বলি, শিবিকুমারের দানে পরিতুষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় দৃষ্টি দান করেছিলেন রাজাকে। গল্পটি ভারতের চিরাচরিত আদর্শের যেমন এক উল্লেখযোগ্য আলেখ্য, অপরদিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চক্ষু অধিরোপণ প্রণালীরও একটি বিশেষ নিদর্শন।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র

রাশিচক্র গণনা

আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি সূর্য একটা বিশেষ পথে প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমা করছে,—যদিও পথটি বছরের সব সময় নির্দিষ্ট থাকে না। কখনও একটু দক্ষিণে সরে যায়, কখনও আবার উত্তরে। সূর্যের গড় গতিপথকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা সূচিত করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। নাম দিয়েছিলেন রবিমার্গ। বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্য-পরিক্রমার পথকে বলা হয় ক্রান্তিবৃত্ত। ক্রান্তিবৃত্ত পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাকাশের গায়ে একটি গোলাকার কটিবন্ধনী। ক্রান্তিবৃত্ত এবং রবিমার্গ একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে চন্দ্রের কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে ক্রান্তিবৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের সাতাশটি ভাগের কথা বলা হয়েছে। তিথি গণনার সুবিধার জন্য হিন্দু জ্যোতিষীরা এইভাবে ভাগ করেছিলেন। একমাত্র পঞ্জিকা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তিথি গণনার প্রয়োজন বড় একটা হয় না। বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিথির কোন গুরুত্ব নেই। তার একমাত্র কারণ মনে হয় চন্দ্রের দৈনিক গতির মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব। এইজন্য পরবর্তীকালে রাশিচক্র গণনা অপরিহার্য হয়ে উঠে। দেখা গেছে, রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্তকে বারটি সমান ভাগে ভাগ করলে এক-একটি ভাগ এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জ অধিকার করে বসে। আবার সেই নক্ষত্রপুঞ্জের প্রত্যেকটির মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করলে এক-একটি পুঞ্জ এক-একটি বিশেষ মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে। এই মূর্তিগুলির আকার যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের মত। তাই নক্ষত্রপুঞ্জগুলির নামকরণ করা হয়েছে মূর্তিগুলির নাম অনুসারে। বারটি নক্ষত্রপুঞ্জকে বলা হয় বারটি রাশি। সব রাশিগুলি একত্রে রাশিচক্র।

রাত্রির আকাশে চন্দ্রকে দেখা যায়, আবার নক্ষত্রগুলিকেও দেখা যায়। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব চন্দ্র প্রতিদিন একটা স্থির নক্ষত্রের সন্নিকটে উদিত হয় না। আজ যে সময়ে আকাশের যে নক্ষত্রটির কাছে চন্দ্রকে দেখা গেল আগামীকাল আর সেখানে দেখা যাবে না। বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান করবে। কিন্তু সূর্যের বেলায় এমনটি হয় না। চন্দ্রের গতিপথে আদৌ শৃঙ্খলা

না থাকলেও সূর্যের গতিপথে আছে অত্যন্ত শৃংখলা। দিনের বেলা যদি নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যেত তাহলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হত যে সূর্য এক-একটি স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর দিয়ে দিনের পর দিন পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্য স্থির আছে কিন্তু পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাক খাচ্ছে বলে সূর্যকে নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর দিয়ে পূর্ব দিকে যেতে দেখব। সারা বছর ধরে লক্ষ্য রাখলে আরও জানা যায়, বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে সূর্য একটা নির্দিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের সমীপবর্তী হয় তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। পুনরায় বৎসরান্তে আবার সেই বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জটির কাছে আসে। ১লা বৈশাখ বাংলা বর্ষারম্ভ। ঐদিন সূর্যকে দেখা গেল মেষ নক্ষত্রপুঞ্জ বা মেষ রাশির কাছে। তারপর প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে যাবে সূর্য। প্রায় ত্রিশ দিনের মাথায় দেখা যাবে সূর্য এসে পড়েছে আর একটি নক্ষত্রপুঞ্জ বৃষ রাশির কাছে। এইভাবে প্রতি ত্রিশদিন অন্তর অন্তর এক একটি রাশিকে অতি-ক্রম করতে করতে পুনরায় বর্ষারম্ভে এসে পৌঁছাবে মেষ রাশির কাছে। কেবল সূর্য নয়, যে সমস্ত গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমা করে তাদেরও দেখা যায় ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গের উপর ভ্রমণ করতে। যদিও তাদের প্রত্যেকের গতিপথ ভিন্ন, তবুও অতিদূরে অবস্থান করছে বলে সূর্যের মত গ্রহরাও রাশিচক্রের উপর দিয়ে ভ্রমণ করছে মনে হয়।

রাত্রির আকাশের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে ঐ রাশিচক্রকে দেখতে পাব। পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সব সময় অবস্থান করছে ছ'টি রাশি আর পৃথিবীর বিপরীত দিকে মহাশূন্যে অবস্থান করছে আরও ছ'টি রাশি —মোট বারটি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যার সময় পূর্বাকাশে বৃশ্চিক রাশিকে দেখে বেশ চেনা যায়। সূর্য তখন অবস্থান করে বৃষ রাশিতে, সেইজন্য সূর্যাস্তের সময় বা অল্প পরে সূর্য যে রাশিতে অবস্থান করছে তার থেকে ষষ্ঠ রাশিটি দেখা যাবে পূব আকাশের গায়ে। মহাকাশের গায়ে কল্পিত রাশিচক্রের বেষ্টনীটি যে কোন সময়ে অর্ধবৃত্তাকার ধরা যেতে পারে। ঐ অর্ধবৃত্তের মধ্যে মোট ছ'টি রাশি সব সময় অবস্থান করছে। এক-একটি রাশি ক্রান্তিবৃত্তের ৯° উত্তর থেকে ৯° দক্ষিণ পর্যন্ত স্থান অধিকার করে থাকে।

রাশিচক্রটি যেন একটি ঘড়ির ডায়াল। ডায়ালের উপর লিখিত বারটি সংখ্যাকে বারটি রাশি এবং ডায়ালের মাঝখানে, যেখানে কাঁটাগুলো লাগান

থাকে সেই ছিদ্রটাকে পৃথিবী ধরা যেতে পারে। ডায়ালটি যেহেতু বৃত্তাকার, তাই ছিদ্রটি ডায়ালের কেন্দ্র। কেন্দ্রকে ভেদ করে উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে দুটি সরলরেখা টানলে বৃত্তটি সমান চার অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কেন্দ্রে তখন সৃষ্টি হবে চারটি সমকোণ।

আরও সহজভাবে বলা যেতে পারে। ঘড়ির দুটি কাঁটার একটি যখন ১২-তে এবং অপরটি ৬-তে অবস্থান করে তখন সেই কাঁটা দুটির অবস্থান একটা রেখা দিয়ে যোগ করা হল। আবার একটি কাঁটা যখন ৩ এবং অপর কাঁটা যখন ৯ সংখ্যাদ্বয় নির্দেশ করবে তখন তাঁদেরও অবস্থান রেখা দিয়ে যোগ করা হল। তাহলেই দেখা যাবে কেন্দ্রে চারিটি সমকোণের সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের ঐ চার সমকোণের পরিমাণ ৩৬০°। ৩৬০কে ১২ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৩০। সেইজন্য ঘড়ির ডায়ালে যে সংখ্যাগুলো লেখা থাকে তাদের পর পর দুটি সংখ্যা থেকে দুটি রেখা কেন্দ্র পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে কেন্দ্রে ৩০° কোণ উৎপন্ন করবে। রাশিচক্রকে ঘড়ির ডায়াল এবং পৃথিবীকে ঐ ডায়ালের কেন্দ্র বলে কল্পনা করা হয়েছে। তাই পৃথিবীতে রাশিচক্র কোণ সৃষ্টি করছে ৩৬০°। পর পর দুটি রাশির কৌণিক ব্যবধানও পৃথিবী থেকে ৩০°। সূর্য যেহেতু প্রায় ত্রিশ দিনে এক-একটি রাশি অতিক্রম করছে তাই ধরতে হবে ৩০ দিন বা এক মাসে সূর্য ৩০° অগ্রসর হয় এবং প্রতিদিন অগ্রসর হয় মাত্র ১° ডিগ্রীর মত।

দেখা যাচ্ছে সূর্য একমাস ধরে একটি রাশিতে অবস্থান করে। বৈশাখ মাসে অবস্থান করে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠে বৃষ রাশিতে, আষাঢ়ে মিথুন রাশিতে, শ্রাবণে কর্কট রাশিতে, ভাদ্রে সিংহ রাশিতে, আশ্বিনে কন্যা রাশিতে, কার্ত্তিকে তুলা রাশিতে, অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক রাশিতে, পৌষে ধনু রাশিতে, মাঘে মকর রাশিতে, ফাল্গুনে কুম্ভ রাশিতে এবং চৈত্রে মীন রাশিতে। আবার ১লা বৈশাখ সূর্য মেষ রাশির ১° ডিগ্রীতে, ২রা ২° ডিগ্রীতে, ৩রা ৩° ডিগ্রীতে, এইভাবে ২৯ তারিখে ২৯° ডিগ্রীতে, তারপর ৩০ তারিখে বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করবে। সংক্রমণের দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। বৈশাখের শেষ দিনটিকে সেই কারণে বলা হয় বৃষ সংক্রান্তি, জ্যৈষ্ঠের শেষ দিনটিকে মিথুন সংক্রান্তি, আষাঢ়ের শেষ দিনটিকে কর্কট সংক্রান্তি,·········পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে মকর সংক্রান্তি,··· ······চৈত্র মাসের শেষ দিনটিকে মেষ সংক্রান্তি।

প্রথমেই বলা হয়েছে গ্রহদের গতিবিধি সূর্যের মত নয়। যদিও তারা রাশিচক্র

পরিক্রমা করছে তথাপি সবাই ৩০ দিনে পরিক্রমা শেষ করছে না। নিজ নিজ গতি অনুযায়ী বিভিন্ন সময় অন্তে শেষ করে পরিক্রমা। দেখা গেছে এক একটি রাশিকে অতিক্রম করতে চন্দ্রের লাগে ২½ দিন, বুধের ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পতির এক বছর, শনির আড়াই বছর, অপরাপর গ্রহদের আরও অনেক বেশী সময় লাগে। সূর্যের ক্ষেত্রে সূর্য স্থির, রাশিচক্র স্থির, কেবল পৃথিবীকে গতিশীল ধরা হয়। গ্রহদের ক্ষেত্রে একমাত্র রাশিচক্র স্থির। পৃথিবী ও গ্রহ উভয়েই গতিশীল। এইজন্য গ্রহরা সব সময় সমগতিতে এবং একই দিকে অগ্রসর হয় না। কখনও কখনও বিপরীত দিকেও অগ্রসর হতে দেখা যায়। তখন ঐ গ্রহকে পঞ্জিকার ভাষায় বক্রী হয়েছে বলা হয়।

রাশিচক্র স্থির বলে ওদের সূর্যের মত উদয় অস্ত হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই। বারটি রাশির প্রত্যেকেরই দৈনিক উদয় অস্ত হচ্ছে। প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর এক-একটি রাশি পূর্বাকাশে উদিত হচ্ছে, অপর দিকে পশ্চিম আকাশেও প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর এক-একটি রাশি অস্ত যাচ্ছে। সূর্য যখন যে রাশিতে অবস্থান করে তার বিপরীত দিকে সব সময় অবস্থান করছে সেই রাশি থেকে ষষ্ঠ রাশিটি। তাই রাত্রিতে আমরা সূর্য অবস্থানের বিপরীত রাশিটি আকাশে সব সময় দেখতে পাই।

চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে নক্ষত্রচক্র বা 'ভ' চক্রের কথা আলোচিত হয়েছে। এখন রাশিচক্রের কথা বলা হল। এক কথায় বলা যেতে পারে, মহাকাশে রবিমার্গের পথে বারটি রাশি এবং সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। নক্ষত্রের দিক থেকে রাশিকে বিচার করতে গেলে এক রাশি থেকে আর একটা রাশির মধ্যে অবস্থান করছে ২¼টি বা ২¼টি নক্ষত্রপুঞ্জ। যখন কোন গ্রহ বা উপগ্রহ যে রাশি বা নক্ষত্রের সমীপবর্তী হয় তখন সেই গ্রহ বা উপগ্রহের ভোগ্য রাশি এবং ভোগ্য নক্ষত্র বলে মনে করা হয়। ধরা যাক কোন একদিন একটি গ্রহ মেষ রাশির অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থান করছে। সেইদিন সেই গ্রহের ভোগ্য রাশি হবে মেষ রাশি এবং ভোগ্য নক্ষত্র হবে অশ্বিনী নক্ষত্র। ভারতীয় পঞ্জিকায় এইভাবে রাশি ও নক্ষত্র গণনা করা হয়। আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশির সঞ্চার দেখে নবজাতকের জন্মপত্রিকাও রচনা করা হয়ে থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষ মতে সূর্যও একটি গ্রহ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সূর্যকে গ্রহ বলা উচিত নয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের রাশি সঞ্চার এবং পৃথিবীর উপর তার আকর্ষণ লক্ষ্য

করেই তাকে একদিন প্রাচীন ভারত গ্রহ নামে সূচিত করেছিল। আজও পঞ্জিকায় "রবি" গ্রহ। জ্যোতিষ গণনার ক্ষেত্রে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্রের যে অনেকখানি গুরুত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই রাশিচক্র এবং রবিমার্গের কল্পনাও ভারতের নিজস্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করতে চান না। আমরা জানি, সেই আদিম যুগ থেকেই ভারতীয় পঞ্জিকা নবজাতকের জন্মপত্রিকা তৈরী করে আসছে। সূর্য সারা বছরে বারটি রাশির উপর দিয়ে অগ্রসর হয় বলে বছরকে বার মাসে ভাগ করেছে, আবার মাস-গুলির নাম করেছে রাশির নামানুযায়ী, সূর্যের রাশি-সংক্রমণকে সংক্রান্তি নাম দিয়েছে। অধিকন্তু সংক্রান্তিগুলির নামও দিয়েছে পরবর্তী রাশির নামে, যেমন মেষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি। তবুও অবিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা বলতে চান প্রাচীন ভারত রাশিচক্র গণনা করেনি, রাশিচক্র গণনার প্রেরণা পেয়েছে ভিন্ন দেশ থেকে। একটি কারণের উপর তাঁরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই কারণটি হল ভারতীয় রাশির নামের সঙ্গে মিশরীয় ও চীনের কল্পিত রাশির বহুলাংশে মিল আছে। নিম্নে ভারতীয়, মিশরীয় এবং চৈনিক রাশির নামের তুলনা করা হল।

ভারতীয় নাম	মিশরীয় নাম	চৈনিক নাম
১। মেষ	১। The Ram	১। The Mouse
২। বৃষ	২। The Bull	২। The Ox
৩। মিথুন	৩। The Twins	৩। The Tiger
৪। কর্কট	৪। The Crab	৪। The Hare
৫। সিংহ	৫। The Lion	৫। The Dragon
৬। কন্যা	৬। The Vergin	৬। The Serpent
৭। তুলা	৭। The Balance	৭। The Horse
৮। বৃশ্চিক	৮। The Scorpion	৮। The Sheep
৯। ধনু	৯। The Archer	৯। The Archer
১০। মকর	১০। The Goat	১০। Tha Cock
১১। কুম্ভ	১১। The Water bearer	১১। The Dog
১২। মীন	১২। The fishes	১২। The Boa

ভারতীয় নামের সঙ্গে মিশরীয় নামের বিশেষ প্রভেদ নেই। মাত্র একটি জায়গায় তফাত। চৈনিক নামের সঙ্গে বিশেষ মিল নেই, কেবলমাত্র দু-তিনটি ক্ষেত্রে একটু মিল দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন, জ্যোতির্বিদ্যায় প্রথম উন্নতিলাভ করেছিল ব্যাবিলন-বাসীরা। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রান্তিবৃত্ত এবং নক্ষত্রচক্র গণনার পরিকল্পনা ভারতের। তাঁরাই বলেন, ভারত রবিমার্গের কল্পনা করলেও রাশিচক্রের কল্পনা করেনি। ওটি মিশর ও ব্যাবিলনবাসীদের দান। তাঁদের এই মত অনেক ভারতীয় পন্ডিত গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, ব্যাবিলনবাসীদের বিভাগটি ছিল কেবলমাত্র সূর্যের দৈনন্দিন গতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথমে সূর্যের গতি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেননি, করেছিলেন চন্দ্রের দৈনন্দিন গতি নির্ণয়। সেইখানে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের অন্য পথে গবেষণা করতে হয়েছিল এবং তারই পরোক্ষ ফল রাশিচক্র গণনা।

কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীর মতে চীন, ব্যাবিলন এবং ভারতীয় জ্যোতিষ একই সংগে উন্নতিলাভ করেছিল। কয়েকজন এমনও মন্তব্য করেন যে, ভারত, চীন এবং ব্যাবিলন জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করেছে বিশেষ একটি উৎস থেকে। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঁরা বলেন, চীন, ব্যাবিলন ও ভারত সবাই রাশিচক্রকে বার ভাগে ভাগ করেছে। তাদের বছরের মাসের সংখ্যা বার, সপ্তাহ সাত দিন এবং দিন ও রাশিগুলির মধ্যে আছে যথেষ্ট সাদৃশ্য। কেউ কেউ আবার এদের সংগে গ্রীকদের নামটাও জুড়ে দিয়েছেন। গ্রীকরাও এক সময় জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল সত্য, কিন্তু সে অনেক পরে ; প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী থেলস্-এর সময় থেকে। কালের হিসাবে দেখা যায় মিশর ও চীনের জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার সময় খৃষ্টজন্মের দেড় থেকে দু হাজার বছর পূর্বে। এই সময় ভারতে বৈদিক সভ্যতাও প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ছিল সেই সভ্যতার একটা বড় অংগ। যজ্ঞ যখন তখন অনুষ্ঠিত হত না। বছরের একটা নির্দিষ্ট ঋতু এবং নির্দিষ্ট তিথিতে সম্পন্ন হত। মাস ও বছর গণনা যদি নির্ভুল না হত তাহলে ঋতু এবং তিথি কিভাবে ঠিক রাখতো ? তাই মনে করা যেতে পারে নক্ষত্রচক্র গণনার মত রাশিচক্র গণনাও ভারতের কৃতিত্ব। হয়ত ভারতবাসীদের দেওয়া নামের সংগে সামঞ্জস্য রেখে মিশরীয়রা রাশিচক্রের নামকরণ করেছিলেন।

ঋতুবিভাগ ও মলমাস গণনা

ঋগ্‌বেদে একটি শ্লোক আছে—

বেদামাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপযায়তে ॥

"যিনি ধৃতব্রত হয়ে স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, তিনি ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় তাও জানেন।"

এখানে ত্রয়োদশ মাস বলতে হিন্দুরা যাকে মলমাস বা অধিমাস বলে থাকেন তাকেই বোঝান হয়েছে। আমরা জানি মলমাসে কোন পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান কিছুই সম্পন্ন হয় না। হিন্দুদের পূজা-পার্বণ আবার নির্দিষ্ট একটি ঋতুতে সম্পন্ন হওয়ার রীতি আছে। যেমন শরৎকালে শারদীয় দুর্গোৎসব, বসন্তকালে বাসন্তী পূজা, দোলযাত্রা, শীতকালের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা ইত্যাদি। হিন্দুরা তিথি গণনা করেন চান্দ্রমাস ধরে। একটি চান্দ্রমাস সাড়ে ঊনত্রিশ দিনের কাছাকাছি। চান্দ্রমাস নির্ভর করে চন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমার উপর। ২৭ দিন ৭ ঘণ্টায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করলেও, চন্দ্র প্রথম যে বিন্দু থেকে যাত্রা আরম্ভ করে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে তার লাগে সাড়ে ঊনত্রিশ দিনের একটু বেশী সময়। কারণটা আর কিছুই নয়, পৃথিবী আবর্তন করতে করতে কিছুটা পথ এগিয়ে যায় বলে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টার বদলে সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় লাগে। চান্দ্রমাস তাই সাড়ে ঊনত্রিশ দিন। এই সময়ের মাথায় পর পর অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা আসে। তিথিকে ঠিক রাখতে গেলে সাড়ে ঊনত্রিশ দিনকেই মাস ধরতে হবে। তখন বছর হবে (২৯½ × ১২) ৩৫৩ দিনে। মাসটা আবার সাড়ে ঊনত্রিশ দিনের বেশী বলে নিখুঁত হিসাব হবে ৩৫৪·৪ দিন। চন্দ্রের গতিপথের ভিত্তিতে ৩৫৪·৪ দিনকে ধরা হয় চান্দ্রবছর। কিন্তু বছর বলতে পৃথিবী যে সময়ে একবার সূর্যকে পরিক্রমা শেষ করে সে সময়টাকেও বোঝায়। পৃথিবীর একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫¼ দিন। ৩৬৫¼ দিনে হয় এক সৌরবছর। পৃথিবীর ঋতুগুলি আবার নির্ভর করছে তার সূর্য পরিক্রমার উপর। পৃথিবীর কক্ষপথটাও ঠিক বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার।

সেই কারণে পৃথিবী কখনও একটু সূর্যের দিকে এগিয়ে আসে, কখনও দূরে সরে যায়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ঋতুগুলি নির্ভর করছে পৃথিবীর বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থানের উপর। সূর্যই প্রকৃতপক্ষে ঋতু বিভাগের কর্তা। ঋগ্বেদও সে কথা স্বীকার করেছেন। ভারী সুন্দর একটি উপমা আছে ঋগ্বেদে—

"দুটি ক্রীড়াপরায়ণ বালকের মত সূর্য ও চন্দ্র যেন একটি যজ্ঞশালার চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। একজন ঋতু বিভাগ করছে, অপরজন দৃষ্টি রেখেছে জগতের প্রতি।"

এবার হিন্দুদের ঋতুবিভাগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হল। হিন্দুরা সেই প্রাচীনকালেও ঋতুর সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল ছ'টি। ঋগ্বেদে ছ'টি ঋতুর উল্লেখ আছে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হেমন্ত ও শীত ঋতুকে একটিমাত্র ঋতুতে গণ্য করার জন্য এদের সংখ্যা হয়েছে পাঁচ। প্রাচীনকালে মাসগুলির নাম বর্তমান কালের মত ছিল না এবং বর্ষারম্ভ ধরা হত বসন্ত ঋতু থেকে। প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে দেখা যায় মধু ও মাধব বসন্তকাল, শুক্র ও শুচি গ্রীষ্মকাল, নভস্ ও নভস্য বর্ষাকল, ঈষ ও উর্জ শরৎকাল, তপস ও তপস্য হেমন্তকাল, সহস ও সহস্য শীতকাল। প্রাচীন কালের বর্ষারম্ভ নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন বসন্তই বর্ষারম্ভ, আবার অনেকে এমন মতও পোষণ করে থাকেন যে মকর সংক্রান্তি থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় বলে বর্ষারম্ভ মকর সংক্রান্তির পর ধরা হত। প্রাচীন সাহিত্যগুলির কোন কোনটিতে উল্লেখ আছে চিত্রা-ফাল্গুনী-পূর্ণিমসী থেকে বর্ষারম্ভ। এই মত যদি সত্য হয় তাহলে একমাত্র বসন্তকালে চিত্রা, ফাল্গুনী, ও পূর্ণিমসী পড়ে। অতএব ধরা যেতে পারে প্রাচীনকালে বর্ষারম্ভ গণনা করা হত বসন্ত ঋতু তথা মধু ও মাধব মাস থেকে। এখন প্রশ্ন মধু ও মাধব কোন্ কোন্ মাস?

মধু মাসের বর্তমান নাম চৈত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এখনও চৈত্র মাসকে অনেকে মধু মাস বলে থাকেন। তাহলে মাধব মাসটিকে চৈত্রের পরবর্তী বৈশাখ মাসকে গণ্য করতে হবে। কিন্তু বৈশাখ তো বসন্ত ঋতুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রাচীন ভারত কিন্তু মনে করত চৈত্র ও বৈশাখ তথা মধু ও মাধব বসন্তকাল, শক্র-শুচী বা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মকাল, নভস্-নভস্য বা শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাকাল, ঈষ-উর্জ বা আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎকাল, তপস-তপস্য বা অগ্রহায়ণ-পৌষ

হেমন্তকাল, সহস-সহস্য বা মাঘ-ফাল্গুন শীতকাল। বর্তমানে প্রচলিত ঋতু-সমূহের সঙ্গে একটা মাসের তফাত। আজকের দিনে ফাল্গুন মাসকে শীতকালের মাস এবং বৈশাখকে বসন্তকালের মাস বলে কিছুতেই গণ্য করা যায় না। অথচ ভারতীয় পুরাণগুলি বলছে মধু ও মাধব বসন্তকাল। মাধব অবশ্যই বৈশাখ মাস। চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস মধু ও মাধবকে চৈত্র-বৈশাখ বলে উল্লেখ করেছেন।

এখন স্বভাবতই মনে আসে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা কি এতই ভুল করে-ছিলেন? বৈশাখ মাসকে কি কারণে ধরেছিলেন বসন্ত ঋতুর মাস বলে? হাজার বছর ধরে চলে এসেছে মাধব বসন্ত ঋতুর মাস। গুপ্তযুগে সংশোধন করলেন জ্যোতিষসম্রাট বরাহমিহির। তিনি যে পঞ্জিকা প্রণয়ন করলেন তাতে বলা হল মাধব গ্রীষ্ম ঋতুর মাস। ঋতু বিভাগের ক্ষেত্রে আজও আমরা অনুসরণ করছি বরাহমিহিরকে। কিন্তু ভুল প্রাচীন ভারত করেনি। মাধব তথা বৈশাখকে বসন্ত ঋতুর মাস ধরার পশ্চাতে একটি বড় রকমের বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে। এককালে বসন্ত সত্যই শেষ হত বৈশাখ মাসে। পৃথিবীর অয়ন চলনের জন্য পেছিয়ে এসেছে একটি মাস। অয়ন চলনের কারণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

আমরা জানি, পৃথিবী বিষুব প্রদেশের উপর অবিরত পাক খেতে খেতে ঘুরে আসছে সূর্যের চারদিকে। নিজে যেমন শূন্যে একটা বৃত্তাকার পথের রচনা করছে অপরদিকে তার মেরুদণ্ডটাও শূন্যে রচনা করছে বৃত্ত। তবে সে বৃত্তের পরিধি অতিশয় ক্ষুদ্র নয়, বেশ বড়। বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর গতি তিনটি—একটি আহ্নিক গতি, দ্বিতীয়টি বার্ষিক গতি, তৃতীয়টি মেরু গতি বা অয়নগতি। ভূ-মেরুর প্রদক্ষিণকাল সুবৃহৎ। এক-আধ দিন বা এক-আধ বছর নয় সুদীর্ঘ ছাব্বিশ হাজার বছর। ভূ-মেরুর প্রদক্ষিণের ফলে মহাশূন্যে লক্ষ্যস্থলও একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়। ধরা যেতে পারে, আজকের পৃথিবী উত্তরের ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য রেখে পথ পরিক্রমা করছে। কয়েক হাজার বছর পরে আর তার ধ্রুবতারা লক্ষ্য থাকবে না—ধীরে ধীরে অন্যত্র সরে যাবে। আবার আজ থেকে ছাব্বিশ হাজার বছর পরে আজকের মত পুনরায় ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে পথ চলবে। পৃথিবীর মেরুগতি বা অয়ন চলনের জন্য এমনটি একদিন ঘটতে বাধ্য।

প্রাচীন ভারতীয় পঞ্জিকা বৈশাখ মাসকে গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্ভুক্ত না করে বসন্ত ঋতুর অন্তর্ভুক্ত করায় কোন ভুল করেনি। সেদিন চৈত্র মাসেই বসন্ত আসত এবং শেষ হত বৈশাখে। অয়ন চলনের জন্যই একমাস সরে গেছে। কতদিন আগে এই ঘটনা ঘটত তাও হিসেব করে বলে দেওয়া যায়। যেহেতু ছাব্বিশ হাজার বছরে পৃথিবী ভূ-মেরু প্রদক্ষিণ করে তাই ঋতু পরিবর্তন জাতীয় নৈসর্গিক কিছু পরিবর্তন আমরা দু থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে একেবারে টের পাব না। ঋতুর কাল একমাস পিছিয়ে গিয়ে পরবর্তী মাসে আসার জন্য প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের দরকার। হয়েছিলও তাই। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে ভারতে বসন্ত বিরাজ করত চৈত্র-বৈশাখে। গ্রীষ্ম বিরাজ করত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে, শীত বিরাজ করত মাঘ-ফাল্গুনে ইত্যাদি। পৃথিবীর অয়ন চলনের জন্য প্রাচীন কালের ঋতুর আজকের ঋতুর মিল নেই। এই ঋতু গণনা থেকে আরও একটি তথ্য অনুমান করা যেতে পারে। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতে ঋতুবিভাগ, মাস বছর গণনা প্রভৃতি সবই প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছরের অনেক পূর্বে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল। অনুশীলনও চলেছিল হয়ত শত শত বছর। তাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের মতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান মিশরীয়দের পরে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

এবার মলমাসের কথায় ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি ঋতু নির্ভর করে একমাত্র সূর্য থেকে পৃথিবীর অবস্থানের দূরত্বের উপর। হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদি নির্দিষ্ট ঋতুতে সম্পন্ন হলেও তিথিকে ঠিক রাখতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র তিথির উপর নির্ভর করলে যে কোন অনুষ্ঠান বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে সম্পন্ন হবে না। প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসবে। কারণ সৌরবছর চান্দ্রবছর অপেক্ষা ১১ দিন বেশী। পূর্বে বলা হয়েছে, তিথি গণনা করা হয় চান্দ্রবছর অনুযায়ী। তিথিকে ঠিক রাখলে এ বছর ১লা ফাল্গুন যদি বসন্তকাল আরম্ভ হয় তাহলে পরবর্তী বছর ১১দিন পূর্বে অর্থাৎ মাঘ-মাসে আরম্ভ হবে। এইভাবে কয়েক বছর পরে দেখা যাবে বসন্ত কাল শীতের সময় বা বর্ষার সময় আসছে। পূজা-পার্বণের সময়ও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দুর্গাপূজা কোন বছর শীতকালে, কোন বছর বসন্তকালে, কোন বছর বা গ্রীষ্মকালে আসবে। যেমন মুসলমানদের পর্বগুলো অনুষ্ঠানের সময় প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁরা চান্দ্রবছর

ধরে হিসেব করেন বলে তাঁদের কোন পর্ব বছরের একই ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয় না, সারা বছর ধরে আবর্তিত হয়। হিন্দুরা চান্দ্রবছর ধরে পঞ্জিকা গণনা করলেও ঋতুর উপর জোর দেয় বেশী। সেইজন্য প্রায় প্রতি তিন বছর অন্তর এক-একটি মাসকে বাদ দেওয়া হয়। ঐ মাসটিকে বলা হয় মলমাস। প্রকৃতপক্ষে মলমাসের দিনগুলো হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া দিন। চান্দ্রবছর অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের উদ্বৃত্ত দিনের সংখ্যা এগার। ৩২টি সৌরমাসে ৩৩টি চান্দ্রমাস হয়, ৩২তম মাসের পর ৩৩তম মাসটিকে মলমাস ধরা হয়। তিথি হিসাবে দেখা গেছে প্রতি ৩৩তম মাসটিতে দুটি অমাবস্যা এসে যায়। পূর্ববর্তী বছরের দিনগুলো বলেই এই মাসে পুজো-পার্বণ সবই নিষিদ্ধ। ঋতুকে ঠিক রেখে চান্দ্রবছর অনুযায়ী গণনা করলে এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রাচীনকালেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চান্দ্রবছর ও সৌরবছরের তফাত তাঁরা ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তার একমাত্র প্রমাণ ঋগ্বেদ। মলমাসের কথা একমাত্র হিন্দু পঞ্জিকা ছাড়া অন্য কোন দেশের পঞ্জিকায় ব্যবহার নেই। মলমাসের গণনা ভারতের একেবারেই নিজস্ব এবং প্রাচীন ভারতবাসীর উন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞান চিন্তার ফল।

প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য ও চন্দ্রের গতি দেখেই এ সব গণনা করতেন এবং আজও সে পদ্ধতি পঞ্জিকায় অনুসৃত হয়। তবে মনে হয় প্রাচীন কালে পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীর বার্ষিক গতি, অয়ন চলন ইত্যাদি জানা ছিল না। যদিবা কেউ এই ধরনের মত প্রচার করতেন তাহলে তাঁর মত গ্রাহ্য হত না। কেবলমাত্র রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা তাঁরা সব তথ্য ঠিক ঠিক ভাবে নির্ণয় করে নিতে পারতেন এমনই সূক্ষ্ম ছিল তাঁদের গবেষণা। ঋগ্বেদ রচনার অনেক কাল পরেই ভারত টের পেয়েছিল সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করছে সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

রাশিচক্র গণনা

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষ গ্রহণ সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার পোষণ করে আসছে। এখনও সে কুসংস্কার যে একেবারে তিরোহিত হয়েছে তা নয়। মানুষ দেখত আকাশে সূর্য ও চন্দ্র নিত্য পরিক্রমারত। কিন্তু এমন একটা দিন আসে যেদিন সূর্য বা চন্দ্রকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কিছু-ক্ষণের জন্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে যেতে হয়। অথচ আকাশ থাকে নির্মেঘ। প্রথমে ভীতি পরে ভীতি থেকেই কুসংস্কারের জন্ম। গ্রহণ দেখলেই আগেকার মানুষ মনে করত একটা বড় রকমের দুর্যোগ নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে। ঝড়-বন্যা-ভূমিকম্প-অনাবৃষ্টি-শস্যহানি-রাজার মৃত্যু এমন কত কি? আজও বাংলার কৃষক মনে করেন কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণ হলে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাবে না।

আগেকার দিনে মানুষের আবার ধারণা ছিল গ্রহণ হচ্ছে দেবতার রোষবহ্নি। পূর্বাহ্ণে অবগত হতে পারলে ক্রুদ্ধ দেবতার রোষ শান্তির ব্যবস্থা হতে পারে নানান ধরনের পুজো-আচ্চা যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মাধ্যমে। গ্রহণ তাই পূর্বাহ্ণে নির্ণয় করার প্রয়োজন উদ্ভূত হয় সেই প্রাচীনকালে সব দেশে। চীনদেশের ইতিহাসে কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব ২১৩৭ অব্দে 'হি' ও 'হো' নামে দুজন জ্যোতির্বিদকে রাজা হত্যা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের অপরাধ ছিল গণনার দ্বারা পূর্বাহ্ণে গ্রহণের কথা ঘোষণা করিতে সক্ষম হননি। কাহিনীটি থেকে একটা তথ্য অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সেই সু-প্রাচীন কালে পৃথিবীর মানুষ গ্রহণের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারতেন। যাঁরা গ্রহণ নির্ণয় করতে পারতেন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যধিক জ্ঞানী বা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতেন।

গ্রহণ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। ভারতে প্রচলিত গল্পটি সমুদ্র মন্থনের গল্পে পাওয়া যায়। ক্ষীরোদসাগর মন্থনে উত্থিত অমৃত বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধারণ করে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বণ্টন আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কপট ও অত্যাচারী দানবকুলকে অমৃত থেকে

বণ্টিত করা। হয়েছিলও তাই। কিন্তু রাহু নামে এক চতুর অসুর দেবতাদের মধ্যে বসে গিয়েছিল ঠিক সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবের মাঝখানে। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে রাহুর চালাকির কথা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর কর্ণগোচর করলেন। বিষ্ণু কালবিলম্ব না করে সুদর্শন দিয়ে ছিন্ন করলেন রাহুর মস্তক। ততক্ষণে অমৃতটা রাহুর কেবল মুখে ছিল. গলনালী তখনও অতিক্রম করেনি। অমৃত লাভ করেছিল বলে কাটামুণ্ড অমর হয়ে আকাশে বিচরণ করতে লাগল। সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি তার দারুণ আক্রোশ। যখনই সুবিধা পায় তখনই গিলে ফেলে চাঁদকে। কিন্তু রাহুর গলা তো কাটা, গিলে ফেললেও অল্পক্ষণের মধ্যে সূর্য বা চন্দ্র কাটা গলার ভিতর দিয়ে অক্লেশে বেরিয়ে আসেন।

গ্রহণের সঙ্গে অনেকগুলি সংস্কারও জড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা মনে করে আসছেন গ্রহণকাল অতি পুণ্য সময়। গ্রহণের সময় দান এবং স্নান দুইই প্রশস্ত। কথিত আছে, গ্রহণকালে ব্রাহ্মণকে কিছু দান করতে হয়, সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মূর্খ পাপী-তাপী যাই হোক না কেন। গ্রহণকালে ব্রাহ্মণের বিচার নেই, ব্রাহ্মণ মাত্রই সে সময় ব্যাসতুল্য এবং গঙ্গাজল-সদৃশ। চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্যগ্রহণের সময় দান ও স্নান দশগুণ পুণ্যফল প্রদান করে। রবিবারে যদি সূর্যগ্রহণ হয় এবং সোমবারে যদি হয় চন্দ্রগ্রহণ তাহলে হবে চূড়ামণি যোগ। চূড়ামণি যোগে দানে ও স্নানে আবার অধিক পুণ্য অর্জিত হয়। অন্যের পাপ নিজের মধ্যে সংক্রমিত হবে এই সংস্কারের বশবর্তী হওয়ার জন্য বহু সদ্ ব্রাহ্মণ গ্রহণকালে দান গ্রহণ করেন না।

গ্রহণের সময় পান ও ভোজন উভয়ই নিষিদ্ধ। গ্রহণ মোক্ষের পরে স্নান সমাপন করে পাক করেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। গ্রহণের পূর্বে পাক করা দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। গ্রহণের সাতদিনের মধ্যে কোন শুভকাজ বা কোথাও যাত্রা পঞ্জিকা নিষিদ্ধ করেছে। এখনও অনেকে এ নিয়ম মেনে চলেন।

গ্রহণ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে যত প্রকারের গালগল্প প্রচলিত থাক্ না কেন, গ্রহণের প্রকৃত তথ্য এখন আর অজ্ঞাত নয়। দেখা গেছে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখায় আসে। অমাবস্যায় চন্দ্র থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এবং পূর্ণিমায় চন্দ্র থাকে পৃথিবীর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ পূর্ণিমায় সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে পৃথিবী। যদি কোন রকমে তারা একই সরলরেখায় এসে যায় তাহলে অমাবস্যায় সূর্যকে আড়াল করে রাখবে চন্দ্র।

পৃথিবীর মানুষ কিছুক্ষণের জন্য সূর্যকে হয় আংশিকভাবে নয়ত সম্পূর্ণরূপে দেখতে পায় না ; তখন হয় সূর্যগ্রহণ। পূর্ণিমাতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী থাকে বলে একসমতলে এলে পৃথিবীর ছায়া আংশিক অথবা পূর্ণভাবে চন্দ্রকে ঢেকে ফেলে এবং তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রের যদি নিজস্ব আলো থাকতো তাহলে এমনটি হত না। প্রতি পূর্ণিমায় কিংবা প্রতি অমাবস্যায় তারা একই সমতলে আসতে পারে না বলে সব অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় গ্রহণ হয় না। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় বলে পৃথিবীর উপর অল্পস্থান জুড়ে সূর্যগ্রহণ দেখা যায় এবং সূর্যের বলয়গ্রহণও হয়ে থাকে। পূর্ণিমার রাত্রিতে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা চোখ বন্ধ করে অপর চোখের সামনে একটা টাকা কিংবা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা ধরে চন্দ্রের দিকে তাকালে প্রথমে চন্দ্রকে দেখা যাবে না। কিন্তু মুদ্রাটিকে ধীরে ধীরে চন্দ্রের দিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে একসময় চাঁদের মাঝখানটা দেখা যাবে না, কেবল তার চারপাশে চাঁদের আলোকিত অংশ দেখা যাবে। চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে ছোট বলে চন্দ্রের বলয় গ্রহণ হয় না। সূর্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর অতি অল্পস্থান জুড়ে পড়ে, তাই বিরাট এলাকা জুড়ে যেমন সূর্যগ্রহণ দেখা যায় না, তেমনই সূর্যের বলয়গ্রহণও হয়ে থাকে। এই হল গ্রহণের সাধারণ নিয়ম।

প্রকৃতপক্ষে ওদের সমতলে আসার একটি নিয়ম আছে। অতি প্রাচীনকালে ভারত বুঝতে পেরেছিল রবিকক্ষ ও চন্দ্রকক্ষ এক সমতলে নয়। এই দুই কক্ষ সামান্য বক্রভাবে অবস্থান করছে এবং এই দুই কক্ষের কৌণিক ব্যবধান প্রায় ৫° ডিগ্রী। কক্ষপথ দুটি ছেদ করেছে দুটি বিন্দুতে। একটি উচ্চপাত বিন্দু বা অ্যামেণ্ডিং নোড বা রাহু, অপরটি নিম্নপাত বিন্দু বা ডিমেণ্ডিং নোড বা কেতু। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার শেষ মুহূর্তে যদি কখনও চন্দ্র ঐ দুই বিন্দুর তথা রাহু বা কেতুর কোন একটির সমীপবর্তী হয় তাহলেই গ্রহণ হবে। বিন্দুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে চন্দ্র এলেই পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য এক সমতলে আসে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ গণনা করে স্থির করেছেন যে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে দুবার চন্দ্র রাহুর সন্নিকটবর্তী হবেই, কিন্তু কেতুর কাছাকাছি নাও আসতে পারে। সেইজন্য বছরে কমপক্ষে দুটি গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী এবং সে দুটি হবে সূর্যগ্রহণ। রাহুর কাছে চন্দ্র এলে হয় সূর্যগ্রহণ এবং কেতুর কাছে চন্দ্র এলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। হিসাব করে দেখা গেছে বছরে সবচেয়ে যদি বেশী গ্রহণ হয় তাহলে হবে সাতটি। সাতটির

মধ্যে পাঁচটি বা চারটি হবে সূর্যগ্রহণ, দুটি অথবা তিনটি হবে চন্দ্রগ্রহণ। প্রতি একশ বছরে গ্রহণের গড় হিসেব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১টি। এদের মধ্যে ২৩৭টি সূর্যগ্রহণ এবং ১৫৪টি চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের পুনরাবৃত্তিও হয়ে থাকে। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ-শ কিংবা ছ-শ বছর পূর্বে কেলেডীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা গণনার দ্বারা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের পুনরাবর্তনের নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা স্থির করেছিলেন ২২৩ চান্দ্রমাসে বা ১৮ বছর ১১ দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় পৃথিবীর চতুর্দিকে একটা পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। এই সময়কে অর্থাৎ ১৮ বছর ১১ দিনকে একটি "কল্প" বলে চিহ্নিত করেন। প্রতি কল্পে গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ প্রথম কল্পে বা ১৮ বছর ১১ দিনে যে কয়েকটি গ্রহণ হয়ে থাকে পরবর্তী কল্পে বা ১৮ বছর ১১ দিনে ঠিক সেই সেই গ্রহণগুলি দেখা যাবে। এই গ্রহণচক্রকে তাঁরা "স্যারোসচক্র" নাম দিয়েছিলেন।

কথাটি আরও একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কেলেডীয় বিজ্ঞানীরা প্রতি ১৮ বছর ১১ দিনকে একটা যুগ ধরতেন। তাঁরা নির্ণয় করেছিলেন এই ১৮ বছর ১১ দিনের যুগে সাধারণতঃ ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ ও ৪২টি সূর্যগ্রহণ হয়। পরের ১৮ বছর ১১ দিনের যুগে ও ঐ ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ ও ৪২টি সূর্যগ্রহণ হবে। আরও মজার কথা পূর্ববর্তী যুগের যে যে দিনে যে যে গ্রহণ হয়েছিল পরবর্তী যুগে সেই সেই দিনে ঠিক সেই সেই গ্রহণ দেখা যাবে। সময়ের হিসাবে পূর্ববর্তী গ্রহণ থেকে পরবর্তী গ্রহণ আট ঘণ্টা পরে দৃষ্টিগোচর হবে। অবশ্য প্রতি বারে গ্রহণ একই জায়গায় দৃশ্য নাও হতে পারে। এইভাবে ১৮ বছর ১১ দিনের তিনটি যুগ বা কল্পের পরিমাণ ৫৪ বছর ১ মাস। ঐ সময় অন্তে অর্থাৎ ৫৪ বছর ১ মাস পরে আগেকার প্রতিটি গ্রহণ একই স্থানে এবং একই সময়ে দেখা যাবে। এমনই করে চলবে ১২০০ বছর ধরে। ১২০০ বছর পরে গ্রহণগুলি আর দেখা যাবে না। তাই এই ১২০০ বছর স্যারোসচক্রের একটা নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

কেলেডীয় বিজ্ঞানীগণ কোন মানযন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র ভূয়ো-দর্শনের ফলে এমন এক বিস্ময়কর তথ্যের আবিষ্কার করেছিলেন। আজ একথা চিন্তা করতে গেলে সত্যই অবাক হতে হয়। যদিও উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহন করার জন্য তাঁদের দীর্ঘকাল যাবৎ আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল।

হিন্দুরা স্যারোসচক্রের উদ্ভাবক নন। সে কৃতিত্ব একমাত্র কেলেডীয় বিজ্ঞানী-দের। তবে গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে ভারতের দানই অগ্রগণ্য। কেলেডীয় বিজ্ঞানীদের পূর্বেও ভারত এবং অন্যান্য দেশ গ্রহণ গণনা করে পূর্বাহ্নে বলে দিতে পারতেন। ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রের সুপ্রাচীন গ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্তেও গ্রহণের কথা আছে। গ্রহণ গণনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট। তারপর আর্যভট্টের গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন বরাহমিহির এবং ভাস্করাচার্য। সূর্যসিদ্ধান্ত ও চন্দ্রকক্ষের পাতবিন্দুদ্বয়ের কথা আছে। কিন্তু ঐ পাতবিন্দুদ্বয়ের কোন নামকরণ করা হয়নি। পরবর্তী কালে, মনে হয় আর্যভট্টের যুগেই, পাতবিন্দুদ্বয়ের নামকরণ হয়েছে রাহু ও কেতু বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে দুই বিন্দুকে অ্যাসেণ্ডিং নোড এবং ডিসেণ্ডিং নোড বলা হয়। রাহু ও কেতু নামকরণের পরই পুরাণে রাহু ও কেতুকে নিয়ে একটা গল্প খাড়া করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক কাহিনী একটি সুন্দর লোককাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনও হতে পারে গুপ্তযুগে ভারতীয় পুরাণগুলির পুনর্লিখনের সময় রাহু ও কেতুর কথা সমুদ্র মন্থনের গল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গল্পটি যে একটি রূপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস

ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। বৈদিক যুগ, অনুশীলনের যুগ এবং অনুশীলনের পরবর্তী বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের যুগ। প্রথম যুগের ব্যাপ্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত। এই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বেদ পুরাণের কাহিনীগুলিতে। বৈদিক জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রধানতঃ ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে রচিত। ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হত পঞ্জিকার আবার পঞ্জিকা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় জানার। সূর্য চন্দ্রের গতিবিধি নির্ণয় করাও ছিল অত্যাবশ্যক। প্রাচীন ঋগ্বেদে সূর্য, চন্দ্র, সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, মাস, বছর প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ স্থলে সূত্রগুলি তত স্পষ্ট নয়। এমন অনেক অংশ আছে যার ভাবগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন উদাহরণ উপমা, টীকাকারদের টীকা প্রভৃতি থেকে কেবল আন্দাজ করা যেতে পারে যে, বৈদিকযুগেও মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী একটি গোলক এবং তার চারপাশে রয়েছে আকাশ। বেদে ব্রহ্মাণ্ডেরও কল্পনা করা হয়েছে। তবে সে ব্রহ্মাণ্ড আজকের বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের আবার তিনটি বিভাগও কল্পনা করেছিলেন। সেই বিভাগগুলি যথাক্রমে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক।

বৈদিক জ্যোতিষে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহবিশেষ। বৃহস্পতি এবং শনির কথাও অজানা ছিল বলে মনে হয় না। রবিমার্গের কল্পনাও বৈদিক যুগের। রবিমার্গের উপর অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জগুলির পরিচয়ও তাঁরা প্রদান করে গেছেন। বর্তমান পঞ্জিকার মতে নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা ২৭। বৈদিকযুগে ২৮টি নক্ষত্র ধরা হত। নক্ষত্রের নামগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না, তবে অশ্লেষা ও মঘার মধ্যবর্তী নক্ষত্রটির নাম রাখা হয়েছিল অভিজিৎ। ২৮টি নক্ষত্র কল্পনা করার পিছনে যুক্তিও ছিল। চন্দ্রের ভোগকাল ২৭ দিনে সম্পন্ন হয় না, প্রায়

২৭৳ দিন সময় লেগে যায়। সেই থেকে অভিজিতের কল্পনা। বৈদিকযুগে প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীকে ধরা হত না, ধরা হত অশ্বিনীর পরবর্তী তৃতীয় নক্ষত্র কৃত্তিকাকে।

বৈদিকযুগে জ্যোতির্বিদ্যার জন্য কোন পৃথক পুস্তক রচিত হয়নি। মুনি-ঋষিগণ যা উপলব্ধি করতেন তা কেবল শিষ্যদের শিখিয়ে দিয়ে যেতেন। শিষ্যরা আবার শেষবয়সে তাঁদের শিষ্যদের শিখিয়ে যেতেন, এইভাবে শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষাদান চলে আসত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঋষিগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে-সব স্তব রচনা করতেন তাতে কিছু কিছু যুক্ত করে দিতেন। ঋগ্বেদের অনেকগুলি ঋকে সে পরিচয় লুক্কায়িত। প্রথম মণ্ডলের ২৫-তম ও ১৬ -তম সূক্তে সৌর ও চান্দ্র বছরের উল্লেখ আছে। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪-তম সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে এবং ৩৬-তম সূক্তের একাদশ ঋকে ঋতুর কথা পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের বেশ কয়েকটি সূক্তে বছরের দিন গণনারও উল্লেখ আছে। সূর্যগ্রহণের কথা পাওয়া যায় ৫ম মণ্ডলের ৪০-তম সূক্তের ৫ম ঋকে। আরও মনে হয় আর্যগণের আগমনের পূর্বে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলন চলত। অজ্ঞাতনামা ময়দানবের লেখা সূর্যসিদ্ধান্ত বৈদিকযুগে রচিত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এই ময়দানব এবং নমুচির ভ্রাতা ও রাবণমহিষী মন্দোদরীর পিতা এক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, আর্যরা যখন ভারতে আগমন করেন তখন এদেশে বহু নগর ও অট্টালিকা ছিল। বহু প্রাসাদ বা 'পুর' ধ্বংস করেছিলেন বলে ইন্দ্রদেব পুরন্দর নামে খ্যাত। ত্রিপুরাসুরের তিনটি পুরী ছিল। মহাদেব ত্রিপুরের পুরীগুলি ধ্বংস করে ত্রিপুরারী আখ্যা পেয়েছিলেন। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারত যদি স্থাপত্যশিল্পে এত উন্নতি লাভ করেছিল তাহলে জ্যোতির্বিদ্যায়ও উন্নতি লাভ না করে পারে না। সে যুগে আবার বিজ্ঞানের কোন বিভাগ ছিল না। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, সমুদয়ই একসংগে আলোচনা করা হত। কালক্রমে বিজ্ঞানের পরিধি বেড়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে বহু শাখায় বিভক্ত করে নিয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তে দেখা যায় পূর্তবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক-গুলি বিজ্ঞানের শাখার সমন্বয় ঘটেছে। মনে হয় আর্যরা ভারতের আদি বাসিন্দাদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু কিছু তথ্য লাভ করেছিলেন এবং

পূর্বতন আবিষ্কারের ভিত্তিতে গবেষণা করে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এখন দেখা যাক ভারতের বৈদিক যুগ কত প্রাচীন এবং আর্যদের পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা কেমন ছিল? পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান মিশর ব্যাবিলনের কাছ থেকে ধার করা। আমরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার কাল নিরূপণ করে যদি মিশরীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করতে পারি তাহলে নিশ্চিত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতকে খণ্ডন করতে পারব।

কাল নিরূপণের একটা বড় নিদর্শন ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ এবং একদিনে সৃষ্টি হয়নি। শত শত বছর ধরে বিভিন্ন ঋষি যে-সব সত্য উপলব্ধি করেছিলেন সেইগুলি একসঙ্গে বেদ নামে খ্যাত। ঋগ্বেদের রচনা-কালও শতশত বছর। আমাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠপোষকতায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদগুলি সংকলন করে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে যুধিষ্ঠিরের কালনিরূপণ করতে পারলেই বেদ তথা ঋগ্বেদের সময়কালও ধরা পড়বে।

যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ধারণ করতে হলে পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া কোন উপায় নেই। পৌরাণিক মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে দ্বাপর যুগের শেষে। যুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপন হলেই নিশ্চিত ব্যাসদেব বেদ সংকলন করেছিলেন। দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা ঐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়টা নির্ণয় করে নিতে পারি। পুরাণ বলে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে ৩১০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। বেদব্যাসের পূর্বে যেহেতু বেদ প্রচলিত ছিল তাই মোটামুটি একটা হিসাব দাখিল করা যেতে পারে। ব্যাসদেবের অন্ততঃ কয়েক শ বছর পূর্বে বেদের রচনা আরম্ভ হয়েছিল। এই হিসাবে ধরা যায় ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে। এই মতকে প্রাধান্য দিলে বৈদিক সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তী হয়ে পড়ে।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এ মতকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদৌ হয়নি। কুরুবংশ লতিকা থেকে তাঁরা হিসাব করেন ধৃতরাষ্ট্রের সময় খ্রীষ্টজন্মের হাজার কিংবা বার-শ বছর আগে। ভাষাতত্ত্বের

বিচারেও একদল পণ্ডিত বৈদিক সভ্যতার কাল নিরূপণ করেছেন। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে আছেন ভারতবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিদেশী ভাষাতত্ত্ববিদ্ প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার। এঁদের আলোচনা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

তাঁরা প্রমাণ করেছেন বৈদিক সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গবেষণার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রুশদেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্মস্থান। আনুমানিক ২000 খৃষ্টি-পূর্বাব্দে হিত্তীভাষী একটি গোষ্ঠী এশিয়া মাইনরে এবং ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষী অপর একটি গোষ্ঠী মধ্য এশিয়ার পামির অঞ্চলে বাস করতেন। আর্যভাষী এই গোষ্ঠীটি আনুমানিক ১৫00 খৃষ্টি-পূর্বাব্দে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তর ভারত ও ইরানে প্রবেশ করে। এই মতকে সমর্থন জানালে বৈদিক সভ্যতা মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার অনেক পরবর্তী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এইখানে আমাদের থেমে গেলে চলবে না, আরও এগিয়ে যেতে হবে আগের যুগে, যে যুগে ভারতবর্ষে আর্যরা প্রবেশ করেননি। আজ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ভারতবর্ষেও একটা সুসভ্য নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেটি সিন্ধু সভ্যতা। আদিযুগে পৃথিবীতে কেবলমাত্র মিশরীয়, সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন সভ্যতা উচ্চমানের ছিল না বলে আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবার সিন্ধু সভ্যতাকে মিশরীয় সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন এবং উন্নত বলে মনে করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার যেমন বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার তেমনটি হয় নি, তবে এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই। ধ্বংসাবশেষ যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকেলের মানুষ সোনা, তামা, ব্রোঞ্জের অলঙ্কার ব্যবহার করত, তুলো দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করত, দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহার করত মাপনী দণ্ড, পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করত বাটখারা। তারা গাড়ি তৈরি করত এবং গাড়িতে চাকার সংযোগও করত। তাছাড়া মহেঞ্জোদরোর যে নগরটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার আয়তন ছিল প্রায় এক বর্গমাইল। চল্লিশ ফুট দীর্ঘ, চব্বিশ ফুট প্রস্থ এবং আট ফুট গভীর

ইট দিয়ে গাঁথা একটা সুপরিকল্পিত জলাধার পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে বিরাট এক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। অনেকে অনুমান করেন, অট্টালিকাটির দৈর্ঘ্য এককালে প্রায় ২০০ ফুটের মত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা এটি ছিল একটি শিক্ষায়তন। বহু পুঁথি, শীলমোহর ইত্যাদিও পাওয়া গেছে এখান থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেগুলির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও পাওয়া গেছে, কুঠার, বর্শাফলক, মাছ ধরার বড়শি, আয়না আরও কত কি! তারা বিজ্ঞানে যে যথেষ্ট উন্নত ছিল এইগুলিই তা প্রমাণ করে। প্রায় হাজার বছরের অধিককাল ধরে তারা গড়ে তুলেছিল এত উচ্চমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

সেখান থেকে সে যুগের মানুষদের কিছু কিছু কঙ্কালও হস্তগত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে সেই সব মানুষদেশ ললাটদের ছিল অপ্রশস্ত, নাক চ্যাপ্টা। দু-একটি করোটিও পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় এদের মাথা ছিল লম্বাটে, কতকটা আদি আর্মেনিয় বা আদি অস্ট্রেলিয় শ্রেণীর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তাদের বয়সও নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যায় এরা খৃীষ্ট-পূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর থেকে চার হাজার বছর আগে বর্তমান ছিল। আধুনিক হিসাবে খৃীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে আগমন করে এদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বহিঃশত্রুর আক্রমণেই বিধ্বস্ত হয়েছিল মহেঞ্জোদরো। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭-তম সূক্তে পঞ্চম ঋকে উল্লেখ আছে শৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় "হরিয়ুপীয়া"-র পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখ বংশীয় যজ্ঞপাত্র ধ্বংসকারী বৃচীবৎগণকে নিধন করেছিলেন। সবাই মনে করে থাকেন "হরিয়ুপীয়া" সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম প্রধানকেন্দ্র পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার অন্তর্গত আধুনিক হরপ্পা। ঋক্‌টি নিম্নরূপ—

বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্তিনে চায় মানয় শিক্ষণ্‌।
বৃচীবতো যদ্ধরিয়ূপীয়ায়াং হৎ পূর্বে অর্ধেভিয়সাপরো দর্তৃ॥

মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতেন না এবং অশ্বের ব্যবহার করতেন না। তাই আর্যরা তাঁদের পরাজিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে

কথিত অসুর সম্ভবতঃ এঁরাই। শত্রুতাবশতঃ আর্যরা এঁদের গুণকীর্তন করেননি, তবে এঁদের উন্নত বিজ্ঞানচিন্তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

আর্যদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে আরও জানা যায়, ভারতের বহুস্থানে তখন জনপদ ছিল, এমন কি আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণভারতেও এক-এক ধরনের সভ্যতা প্রচলিত ছিল। অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলকে আর্য ঋষিগণ অপবিত্র ও অনার্য দেশ বলে গণ্য করতেন। কজঙ্গল বা রাজমহল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা আসাম, উড়িষ্যার বৈতরণী নদী থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ কলিঙ্গ, আর্য সভ্যতার পরিমণ্ডলের বহির্ভূত ছিল। আর্যরা এদের সাহিত্যে স্থান দান করেননি সত্য, কিন্তু এরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর ছিল না একথা ভাববার কোন কারণ নেই। আর্যরা উত্তর ভারতের কিছু অংশে নিজেদের প্রাধান্য সুদৃঢ় করলেও আদিবাসীদের পরাজিত করতে পারেননি। রাবণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজার যেসব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তাতে 'রাবণ'রা বিজ্ঞানে আদৌ অনগ্রসর ছিলেন না। এই রাবণ রাজার বাসস্থান সিংহল কি মহেঞ্জোদরো সে বিষয়েও আজ সংশয় দেখা দিয়েছে। রাবণ ছিলেন মহাশক্তির উপাসক। আবার এমন বহু দৈত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক। মহেঞ্জোদরোতে মহাশক্তিরূপী জগন্মাতা, শিব প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গেছে। এঁদের মূর্তিপূজা আর্যদের পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল কিন্তু বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা ছিল আর্যদের অজ্ঞাত।

কালক্রমে আর্যরা এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এককালে দীর্ঘকায়, নীল-চক্ষুবিশিষ্ট, উন্নত-সরল-নাসিকাবিশিষ্ট, হিরণ্যকেশ আর্যগণ এ দেশের কৃষ্ণকায় "নিষাদ", শ্যামল "দ্রাবিড়", পীত "কিরাত" বা অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের দেখে 'দাস' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এ দেশে যখন স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন তখন এই সব দ্রাবিড়, নিষাদ, দস্যু, শূদ্র, কোল, ভীলদের সঙ্গে সহবাস করতে হল। এমনকি বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হল। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান অনার্যদের শাস্ত্র বলে আর অবহেলিত থাকল না। আর্যরাই এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা ও অনুশীলনে। বৈদিকযুগ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলনের যে কাজ শুরু হয় সেটি প্রকৃতপক্ষে আর্যদের পূর্ববর্তী যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞান। আর্য অনার্য উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে কিছু কিছু এ দেশের জ্ঞানী-

গুণীরাও পুস্তক রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হয়ত ময়দানব তাঁদেরই একজন।

অপরদিকে আর্যদের ভারতে আগমন কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে আর্যরা ভারতে আগমন করেছিলেন সুদূর ইউরোপ এবং মধ্যএশিয়া থেকে। তাঁরাও ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ। এঁদের পিতৃভূমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচিন্তাকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন আর্যরা। তাঁদের রচিত স্তবগুলিতে বিজ্ঞানের আভাস পেয়ে যাঁরা মনে করেন ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বহুলাংশে অপরাপর সভ্য দেশের কাছ থেকে ধার করা, তাঁদের কথার মধ্যেও কিছুটা যুক্তি আছে। আর্যরা পিতৃভূমিতে যাতায়াত করতেন এবং সেখান থেকেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের আগমন হত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র। প্রাচীন ভারত এমন অন্ধকারে ঢাকা যে বৈদিকযুগের সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলার উপায় নেই। যদি কোনদিন মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর এবং পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় তাহলে সেইদিনই সঠিকভাবে বলা যেতে পারে।

বৈদিক যুগের পর দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর পূর্ব থেকে পাঁচশ বছর পর পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতে নতুন কোন বিজ্ঞান আলোচিত হয়নি। কেবল পুরাতন আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি। মোট পঁচিশখানি জ্যোতিষ সংহিতা রচিত হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। সেগুলির মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং বৃহস্পতিসংহিতা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাছাড়া রচিত হয়েছিল গর্গ-সংহিতা, পরাশরসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা, ব্যাসসংহিতা, কাশ্যপসংহিতা, মনু-সংহিতা, দেবলসংহিতা ও ভৃগুসংহিতা। এইসব সংহিতাগুলির প্রায় অধিকাংশই লুপ্ত। দু-একটি যা এখনও টিকে আছে তাও দুষ্প্রাপ্য। গর্গসংহিতার একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত পুস্তকগুলি থেকে প্রাচীন সংহিতাগুলির নাম পাওয়া যায় মাত্র। যেমন ব্রহ্ম, বশিষ্ঠ, সূর্য, রোমক ও পৌলিশ এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ নিয়ে রচিত হয়েছিল পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা। দেবলসংহিতা ও কাশ্যপসংহিতা নিয়ে বৃহৎসংহিতা লেখা হয়েছিল। এই দুখানি পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন বরাহমিহির। ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে নিয়ে ব্রহ্মগুপ্ত রচনা করেছিলেন ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্ত। সূর্য-সিদ্ধান্তের প্রতি সর্বকালের মানুষের সমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আজও সূর্যসিদ্ধান্ত প্রচলিত। কিন্তু বর্তমানের সূর্যসিদ্ধান্ত আদি পুস্তক নয়। বরাহমিহির সূর্যসিদ্ধান্ত থেকে যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বলে উল্লেখ আছে পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়, সেসব শ্লোক বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তে নেই। বল্লাল সেনও কিছু সূর্যসিদ্ধান্তের শ্লোক ব্যবহার করেছেন তাঁর অদ্ভুত-সাগর গ্রন্থে। সেগুলিও পাওয়া যায় না। তাই আসল সূর্যসিদ্ধান্ত লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে। বর্তমানের সূর্যসিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তীর অনুকরণ মাত্র।

এই সমস্ত প্রাচীন পুস্তক যদি টিকে থাকত তাহলেও জ্যোতির্বিদ্যার বহু মূল্যবান তথ্য আমাদের হস্তগত হত এবং প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গবেষণারও সুযোগ হত। দুর্ভাগ্য আমাদের এই সমস্ত মহামূল্যবান সম্পদগুলি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আজ যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলি প্রাচীন শাস্ত্রের খোলস মাত্র।

বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষশাস্ত্রের সূচনা

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত হয়। এতদিন পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্র কেবলমাত্র পঞ্জিকা প্রণয়নের কাজেই ব্যবহৃত হত। নক্ষত্র গণনা, রাশিচক্র গণনা, গ্রহণ গণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা থাকলেও গাণিতিক সিদ্ধান্তের উপর এগুলির ভিত্তি ছিল না। ভারতে প্রথম বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত করেন মহর্ষি আর্যভট্ট বা আর্যভট। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বোধ হয় তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চ গণিতকে প্রয়োগ করেন। আর্যভট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের এক সুমহান গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থগুলির মত বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ইতিমধ্যে আর্যভটীয় বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গ্রন্থখানি চারভাগে বিভক্ত। কালক্রিয়া গোলপাদ ও গীতিকাপাদ এই তিনটি বিভাগে উন্নত জ্যোতির্বিদ্যার কথা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থখানির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এতে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ ও আহ্নিক গতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে নতুন এক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে এই গ্রন্থখানি। সবার ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির ; সূর্য এবং চন্দ্রই পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। পাশ্চাত্যে এই নিয়ে পরবর্তীকালে যেমন তর্কের তুফান উঠেছিল, সেদিন আর্যভট্ট তাঁর মত প্রকাশ করাতে কিছু কম তর্কের অবতারণা হয় নি। তিনিই প্রথম মত প্রকাশ করেছিলেন যে, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করার জন্য সূর্যকে উদয় অস্ত হতে দেখি। পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধেও বললেন —

যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্বসত্ত্বৈর্জলজৈ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥

"পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকার। তার চারদিকে জলজ ও স্থলজ জন্তুর দ্বারা পরিবৃত"

পৃথিবীর আহ্নিক গতি সম্বন্ধে বললেন—

"কোন নৌকার আরোহী যদি পূর্বদিকে নৌকাযোগে যাত্রা করে তাহলে তীরবর্তী অচল বৃক্ষাদিকে পশ্চিমদিকে গমন করতে দেখবে। এইভাবে পৃথিবীর আবর্তন হেতু নিরক্ষ দেশের অচল নক্ষত্রসমূহকে পশ্চিম দিকে সচল দেখে।"

আর্যভট্ট জানতেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেউ সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। তাই গীতিকাপাদ গ্রন্থশেষে বলেছেন, "এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যিনি ভূ-গ্রহচরিত অবগত হবেন তিনি গ্রহগণ ভেদ করে পরব্রহ্মে গমন করবেন।"

বিশ্বাস সত্যই কেউ করেন নি। বহু প্রশ্ন তুলেছিলেন বহু বিজ্ঞানী। আর্যভট্টের মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভারতীয় চিন্তাবিদ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। আর্যভট্টের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা আরম্ভ হল। আর্যভট্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে বীজ বপন করলেন সেইটি পরবর্তীকালে অন্যান্য কয়েকজন প্রতিভাধরের হাতে পড়ে ফলে-ফুলে সুশোভিত হল। দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল অনুশীলন। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই সবচেয়ে বেশী দায়ী। ঘনঘন বৈদেশিক আক্রমণ, মানুষের নিরাপত্তার অভাব একদিন শাস্ত্রবিমুখ করে তুলল ভারতবাসীকে। আর্যভট্টের হাতে যে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় চারশ বছর পরে তার ঘটল পরিসমাপ্তি। এই চারশ বছরের মধ্যে ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রে যে অবদান রেখে গেছে, চিরকাল বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করবে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরিচয় আদৌ জানা যায় না। সে যুগে যে-সব সংহিতাগুলি রচিত হয়েছিল তাদের রচয়িতাগণ সবাই ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সংহিতাগুলির নাম থেকে মনে হয় এগুলির প্রবক্তা ছিলেন বৃহস্পতি, পরাশর, বশিষ্ঠ, ব্যাস, গর্গ, মনু, কশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এঁরা সবাই এক-একজন ব্রহ্মর্ষি নামে খ্যাত। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এই সব মহর্ষিদের দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র কথিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুরই ধারক ও বাহক ছিলেন এঁরাই। সংক্ষেপে এঁদের মাত্র কয়েকজনের পরিচয় জ্ঞাপন করা হল। কিন্তু এঁরা নিজেরা সংহিতা রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে এঁদের উক্তিগুলি কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়।

বৃহস্পতি

ঋগ্‌বেদের একজন দেবতা বৃহস্পতি। ইনি দেবতাদের গুরু বলেও খ্যাত। বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তিনি জানতেন না। তাই পুত্র কচকে উক্ত বিদ্যালাভের জন্য প্রেরণ করেছিলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে।

বৃহস্পতির পিতার নাম আঙ্গিরস অর্থবা এবং মাতার নাম সুরূপা। তাঁর একজন পুত্রের নাম ঋষি ভরদ্বাজ, তিনি ছিলেন অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। বিষ্ণুপুরাণের মতে দেবগুরু বৃহস্পতিই ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ করেছিলেন। 'তারা' এবং 'জুহু' নামে বৃহস্পতির দুই পত্নীর উল্লেখ আছে।

বশিষ্ঠ

মহাতেজস্বী ঋষি বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। ইনি দশ প্রজাপতির মধ্যে একজন বলে খ্যাত। মহর্ষি বশিষ্ঠ ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলের একজন ঋষি। বহু পুস্তকের তিনি রচয়িতা। ঋগ্‌বেদের ধর্মসূত্র, একখানি ধর্মসংহিতা,

একখানি জ্যোতিষসংহিতা, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ তাঁর নামে প্রচলিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের তিনি উপদেষ্টা।

কোন কোন পুরাণমতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। অপরমতে ইনি মহর্ষি মিত্রাবরণের পুত্র, মাতা স্বর্গের অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী। বশিষ্ঠের বহু পত্নীর নাম পুরাণে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী, অক্ষমালা ও শতরূপা প্রধান, শতপুত্রের জনক ছিলেন বশিষ্ঠ। পুরাণের মতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে শত্রুতার জন্য বিশ্বামিত্র তাঁর শতপুত্রের বিনাশ করেন। বশিষ্ঠের মত ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি পুরাণে দ্বিতীয় দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের আদর্শ বশিষ্ঠ।

ভৃগু

মহর্ষি ভৃগু সম্বন্ধে বহু কাহিনী পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। সেইসব কাহিনী থেকে মনে হয় ভৃগুর মত এত তেজোদীপ্ত মহর্ষি দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। ইনিই সেই ঋষি যিনি ভগবান বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেছিলেন। বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীবৎসচিহ্ন নামে খ্যাত। ইনি অগ্নিকে 'সর্বভুক্' হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেছিলেন। কথিত আছে, একবার অসুররা বিষ্ণুর ভয়ে ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বিষ্ণু উপায় না পেয়ে গোপনে সুদর্শন পাঠিয়েছিলেন অসুরদের বধ করার জন্য। বিষ্ণুপ্রেরিত সুদর্শন ভৃগুপত্নীর শিরোদেশে আঘাত করে। ফলে ভৃগুর অভিশাপে বিষ্ণুকে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল রামাবতাররূপে এবং দীর্ঘদিন সীতাবিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

ভৃগুবংশের মূল পুরুষ মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং দশ প্রজাপতির একজন। ইনি ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুও একজন। তাঁর পত্নী দক্ষকন্যা খ্যাতি। বিষ্ণুপুরাণের মতে এঁর দুজন পুত্র ধাতা এবং বিধাতা। স্বয়ং নারায়ণপত্নী লক্ষ্মী ভৃগুকন্যা ছিলেন। মহাভারতের মতে যজ্ঞাগ্নি শিখা থেকে মহর্ষি ভৃগুর জন্ম। পত্নীর নাম পুলোমা এবং পুত্রের নাম চ্যবন।

মনু

প্রসিদ্ধ মানব ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা-রচয়িতা মনুকে স্বায়ম্ভুব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে মনুসংহিতা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়।

বহু যুগ ধরে বহু ব্যক্তির দ্বারা রচিত। সংহিতাটিতে ২৬৯৪টি শ্লোক আছে। এতে বিশ্বের উৎপত্তি, যজ্ঞ, কল্প প্রভৃতিতে জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। পুস্তকটিতে প্রকৃতপক্ষে মানবধর্মের মূল কথাগুলি বর্ণিত হয়েছে। এই সুমহান গ্রন্থখানির প্রভাব ভারতকে চিরদিন প্রভাবিত করে এসেছে। কেবল-মাত্র ভারতবর্ষ নয়, ইন্দোনেশিয়া ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশগুলিতেও মনুসংহিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধ-শান্তি, ব্রত-বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত, শুভাশুভ, ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির আচার-আচরণ, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই মনুসংহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু-সংহিতা অদ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থ।

পুরাণে বর্ণিত মনু মানবজাতির আদিপুরুষ। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মনু ব্রহ্মার পৌত্র। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির জন্য একবার নিজ দেহকে নারী ও পুরুষ এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। নারীর গর্ভেই স্বয়ং জন্ম নিলেন এক বিরাট পুরুষ রূপে। সেই পুরুষ আবার তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি করলেন মনুকে। মনু তাই স্বায়ম্ভুব। মনুই প্রজা সৃষ্টির জন্য জন্মদান করেন দশজন প্রজাপতিকে অত্রি, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি। এই প্রজাপতিরাই জন্ম দিয়েছেন সাতজন মনুকে এবং সমস্ত দেবতাদের। পুরাণমতে মনুরাই পৃথিবী শাসন করে থাকেন। এক-একজন মনুর রাজত্বকালকে বলা হয় মন্বন্তর। প্রতি মন্বন্তরের পরে মনু, মনুপুত্রগণ, সপ্তর্ষি, দেব ও মানবগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে চলছে সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল। কোন কোন পুরাণমতে মনুরসংখ্যা আবার চৌদ্দ।

ব্রহ্মা

সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্রের প্রবক্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তা বলে বর্ণিত। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রেরও প্রবক্তা। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশাবলী বলে কথিত।

মনুসংহিতার মতে কারণসলিলে সুবর্ণ অণ্ড থেকে ব্রহ্মার জন্ম। পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে তিনি জাত। জগতের স্রষ্টা তিনি। গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী তাঁর পত্নীত্রয়। অষ্টমাতৃকার অন্যতমা ব্রহ্মাণী তাঁর শক্তি।

দক্ষ, ভৃগু, নারদ এবং সপ্তর্ষি তাঁর পুত্র। পুরাণে কথিত আছে, আদিতে ব্রহ্মা ছিলেন পঞ্চমুখ। শিব তাঁর একটি মুণ্ডচ্ছেদন করায় তিনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা নামে পরিচিত হন। শিবের অভিশাপে তাঁর পূজাও পৃথিবী থেকে লোপ পায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, বলি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে চতুর্মুখ ব্রহ্মার অজস্র মূর্তি পাওয়া গেছে। পুষ্করতীর্থের মন্দিরে ব্রহ্মার নিত্য পূজা হয়। সন্ধ্যাগায়ত্রীর মন্ত্রে, বিবাহের সময়, সূতিকাগৃহে, বাস্তুপ্রতিষ্ঠাকালে আজও আমরা পিতামহদেব প্রজাপতিকে স্মরণ করি।

ব্যাস

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। দ্বিতীয় ব্যাসদেব পৃথিবীতে কোনদিনই জন্মগ্রহণ করবেন না। তাই তাঁর সম্বন্ধে বহু কাহিনী ভারতে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ইনি বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত এবং চিরজীবী।

ব্যাসদেবের পিতা বশিষ্ঠের পৌত্র ঋষি পরাশর, মাতা দাসরাজার পালিতা কন্যা সত্যবতী। ব্যাসদেব কানীন পুত্র। ব্যাসদেবের পুত্র মহাজ্ঞানী শুকদেব। তিনি বেদসমূহের বিভাগকর্তা, তাই বেদব্যাস। গাত্রবর্ণ ছিল ঘনকৃষ্ণ এবং যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এইজন্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেব মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের রচয়িতা। জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ ব্যাসসংহিতা ব্যাসদেবেরই উপদেশ।

গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, প্রভৃতি অপর সবাই মহাতেজস্বী ঋষি।

বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষীগণের পরিচয়

মহর্ষি আর্যভট্ট

আর্যভট্টের জন্মস্থান বর্তমান পাটনার কাছে কুসুমপুর। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আর্যভট্টের রচনা থেকে জানা যায়, তিনি যখন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আর্যভটীয়' রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। একটা সালেরও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন কলিযুগের ৩৬০০ অব্দে পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই থেকে অনুমান করা হয় তাঁর জন্মকাল ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। অনেকে আবার মনে করেন আর্যভট্টের জন্মস্থান কেরালা। প্রসিদ্ধ

ঐতিহাসিক আলবেরুণীর উক্তি থেকে জানা যায় আর্যভট্টের জন্মস্থান যেখানে হোক না কেন তিনি ছিলেন কুসুমপুরের অধিবাসী। কুসুমপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাটলীপুত্রের অনতিদূরে অবস্থিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন (যদি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুকাল ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়)। তবে বরাহমিহিরের পূর্বে আর্যভট্টের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসের সাল তারিখ হিসাব করে আর্যভট্টের পরিচয় পাওয়া যাবে না, বরং অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে উঠবে। শুধু গুপ্তযুগের কোন এক সময়ে তাঁর আবির্ভাবকাল বলে ধরে নেওয়া ভাল। ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষশাস্ত্রের সূচনা করার জন্য তাঁর আর্যভটীয় গ্রন্থখানি ভারতের অমূল্য সম্পদ। এককালে তাঁর সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গ্রীকরাও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত। বলা যেতে পারে আর্যভট্ট পৃথিবীর সর্বযুগের এবং সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

জ্যোতিষসম্রাট বরাহমিহির

বরাহমিহির সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী ভারতে প্রচলিত। সবচেয়ে জোরাল কিংবদন্তীটি খনাকে অবলম্বন করে। ঐ কিংবদন্তীগুলির মধ্যে বিশেষ সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। কিংবদন্তী অনুযায়ী বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় একজন রত্ন ছিলেন। সেই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য অথবা গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। বরাহ-মিহির ছিলেন অবন্তীনগরবাসী এবং উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগ ছিল বলে মনে হয়। কারও কারও মতে বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তবে তিনি যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বরাহমিহির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ এবং অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তাঁর দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একটি বৃহৎসংহিতা, অপরটি পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থখানিতে কেবলমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচিত হয়নি। গ্রন্থখানি প্রাচীনকালের আবহবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই গ্রন্থটিতে তিনি সিমেণ্ট জাতীয় এক ধরনের বস্তুর উল্লেখ করেছেন। তার নাম বজ্রলেপ।

প্রাচীনকালে ঐ বস্তুটির সাহায্যে অট্টালিকা নির্মাণ করা হত। সূর্য-চন্দ্রাদির গতি ও প্রভাব বরাহমিহির এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। পুস্তকটি পাঁচটি অতি-প্রচলিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের আলোচনা। বরাহমিহিরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পঞ্জিকা সংশোধন। অয়নচলনের জন্য পূর্বকালে প্রচলিত ঋতুগুলি একমাস এগিয়ে এসেছিল। বরাহমিহিরই ঋতুগুলির সঠিক সময় নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর ঋতুবিভাগ অদ্যাবধি প্রচলিত। অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে কেবলমাত্র ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করেছেন। বরাহমিহির মধ্যযুগের এক উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁরই নির্দেশিত পথে আজিও ভারতে পঞ্জিকা রচনা করা হয়।

জ্যোতিষী লল্লাচার্য

জ্যোতিষী লল্লাচার্য বরাহমিহিরের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন। আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছুকাল আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লল্লাচার্য নিজেকে আর্যভট্টের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহলে আর্যভট্ট একশ বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম শিষ্যধীবৃদ্ধ। আর্যভটীয় গ্রন্থকে ভিত্তি করে লল্লাচার্য এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সেই হিসাবে লল্লাচার্য আর্যভট্টকে গুরু বলে স্বীকার করতেও পারেন। গ্রহদের গতিবিধির ব্যাপারে তিনি কিছু কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন, কিন্তু আর্যভট্টকে গুরু বলে স্বীকার করলেও গুরুদেবের ভূ-ভ্রমণবাদ স্বীকার করেননি। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে অবিশ্বাসী হয়ে তাঁর পুস্তকে প্রশ্ন করেছেন, "যদি পৃথিবী দ্রুতগতিতে আবর্তন করছে তাহলে মেঘগুলো কেন কেবল পশ্চিমদিকে যায় না? কোন বস্তুকে সজোরে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করলে সেটি পশ্চিমদিকে কেন পড়ে না?"

ভাস্কর

ইনি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের লেখক ভাস্করাচার্য নন, কিংবা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার বৈদান্তিক ভাস্করও নন। বৈদান্তিক ভাস্কর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক, আর ইনি জ্যোতিষী ভাস্কর। সম্ভবতঃ ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর্যভট্টের রচনাকে ভিত্তি করে ইনিও

রচনা করেছেন দু-খানি জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ। একখানি বৃহৎ ভাস্করীয়, অপর-খানি লঘু ভাস্করীয়। দুখানি পুস্তকেই তিনি গণিতের আলোচনা করেছেন এবং গাণিতিক সিদ্ধান্তের উপর জ্যোতির্বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বরাহমিহির এবং লল্লাচার্যের সমসাময়িককালে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত

মনীষী ব্রহ্মগুপ্ত ভারতগগনের আর একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর মত অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্যকে বাদ দিলে ব্রহ্মগুপ্তের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভারতে নেই। তিনি ছিলেন গুর্জরের অধিবাসী। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কথিত আছে, গুর্জরের রাজা ব্যাঘ্রমুখের নির্দেশক্রমে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত রচনা করেছিলেন। পুস্তকখানি ভারতের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার এক সুমহান আলেখ্য। গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৬২৮ অব্দ, ব্রহ্মগুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন স্বীয় পুস্তকের মধ্যে। তবে খ্রীষ্টাব্দ তিনি ব্যবহার করেননি, করেছেন শকাব্দ। বইখানি বহুকাল ধরে পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এমন জগৎজোড়া খ্যাতি একমাত্র চরকসংহিতা ছাড়া ভারতের অপর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটেনি। ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক-কালে প্রচলিত ছিল। গ্রন্থটির আরবী অনুবাদ সিন্দ্‌হিন্দ্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে; ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত আরবীয় মনীষী মহম্মদ বিন ইব্রাহিম আল্‌ ফাজরী আরবী ভাষায় গ্রন্থখানিকে অনুবাদ করেছিলেন। ব্রহ্মগুপ্তের দ্বিতীয় রচনা খণ্ডখাদ্যক। এখানিও আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং নামকরণ হয়েছিল অলকন্দ। একমাত্র ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সারা ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্ত্যকে আবার গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এই গ্রন্থখানি। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর আবর্তন বিশ্বাস করতেন না। আর্যভট্টের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ইনিও কম প্রশ্ন রাখেননি।

দুর্ভাগ্য ভারতের। ব্রহ্মগুপ্ত যদি আর্যভট্টকে অনুমোদন করতেন তাহলে

ফল হত বিপরীত। সমগ্র পৃথিবীকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হত পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট। সমগ্র এশিয়াখণ্ডে তথা ইউরোপে ব্রহ্মগুপ্তের এত জনপ্রিয়তা ছিল যে, তাঁর কথা সবাই বেদ-বাক্যের মত স্বীকার করত। ভূ-ভ্রমণবাদকে সমর্থন করলে মনে হয় সেদিনের মানুষ আর্যভট্টের বিরুদ্ধে এত প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতেন না। পরন্তু সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর নিজের সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে আজও জগৎ স্বীকার করে। ব্রহ্মগুপ্তের জন্য ভারত গৌরবান্বিত।

মুঞ্জাল

ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের পর প্রায় তিনশ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার কোন ভাল পুস্তক রচিত হয় নি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন আর একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। নাম তাঁর মুঞ্জাল। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকখানির নাম লঘুমানস। পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, পরবর্তীকালে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য উক্ত পুস্তক অবলম্বনে রচনা করেছিলেন সিদ্ধান্তশিরোমণি। ভাস্করাচার্য স্বীকারও করেছেন মুঞ্জালের ঋণ। মুঞ্জালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে অয়নাংশ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্ অপেক্ষা গণিতজ্ঞ হিসাবে বিশেষ পরিচিত।

পৃথূদক

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে পৃথুদকের জন্ম হয়। তাঁর রচিত পুস্তকটির নাম সিদ্ধান্তশেখর। পুস্তকটি থেকে জানা যায় ৯৬২ শকাব্দে বা ইংরেজী ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানি রচিত হয়েছিল। পৃথুদকই একমাত্র ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ যিনি সেই সময়ে আর্যভট্টের ভূ-ভ্রমণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন—পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার করে আবর্তন করে। সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি

উল্লেখ করেছেন "নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে গ্রহনক্ষত্রদের উদয় অস্ত হয়। তিনি অত্যন্ত স্পর্ধার সঙ্গে ব্রহ্মগুপ্তের বিরোধিতা করেছিলেন।

পরমাররাজ ধারেশ্বর ভোজ

ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মালবরাজ ভোজ বা সংক্ষেপে ভোজরাজা। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন বীর, অপরদিকে বিদ্যোৎসাহী ও মহাপণ্ডিত। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোজরাজ মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মালবের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। পূর্বে বলা হয়েছে প্রাচীন মালব পরে অবন্তি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু হিউয়েন সাঙ, বাণভট্ট প্রভৃতি অবন্তি এবং মালব উভয়কে পৃথক দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। মালব দীর্ঘদিন ধরে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। এই রাজবংশে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভোজ। তাঁর রাজধানী ছিল ধারা নগরী। সেই কারণে রাজা ভোজ ধারারাজ ভোজ বা ধারেশ্বর ভোজ নামে অধিক পরিচিত।

ধারেশ্বর ভোজ ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর নামে প্রচলিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় একশ-এর কাছাকাছি। অলঙ্কারশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একাধিক পুস্তক এখনও বর্তমান। মনে হয়, এত অধিক সংখ্যক পুস্তক তাঁর দ্বারা রচিত হয় নি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পুস্তকাবলী তাঁর নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে তিনি যে আদৌ পুস্তক রচনা করেননি এমন নয়। বেশ কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ আজিও তাঁর বিরাট প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

ভোজরাজের অমূল্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সরস্বতীকণ্ঠাবরণ' নামে একখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের বই এবং ঐ নামের একখানি ব্যাকরণের পুস্তক, 'যুক্তিকল্পতরু' নামে নীতিশাস্ত্রের পুস্তক, 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক, 'রাজমার্তণ্ড' নামে আয়ুর্বেদের পুস্তক এবং 'রাজমৃগাঙ্ক' নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক প্রধান। বহুমুখী প্রতিভার

অধিকারী ধারেশ্বর ভোজ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী। এককালে সারা উত্তর ভারতে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক 'রাজমৃগাঙ্ক' সুবিদিত ছিল। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মত না হলেও বইটি বিশেষ কতকগুলি কারণে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।

শতানন্দ

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল আরও একখানি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-শাস্ত্র; তার নাম 'ভাস্বতী'। ভাস্বতীর লেখক শতানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে শতানন্দ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। ভাস্বতী গ্রন্থখানি প্রাচীন 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। পঞ্জিকা প্রণয়নের ব্যাপারে বরাহমিহিরের পরেই শতানন্দের স্থান। আজিও পঞ্জিকা রচনার ব্যাপারে ভাস্বতীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

শ্রীপতি

একাদশ শতাব্দীতে আরও কতকগুলি জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক রচিত হয়েছিল। কিন্তু সব পুস্তকের পরিচয় বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। দু-এক-খানি পুস্তকের পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়ান আছে মাত্র। শতানন্দ ও ভোজরাজের সমসাময়িক আর একজনমাত্র প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নাম শ্রীপতি। শ্রীপতি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

অনেকের অনুমান শ্রীপতি উত্তর ভারতের লোক এবং একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। "ধীকোটি" এবং "সিদ্ধান্তশেখর" নামে দুখানি গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বই তিনি রচনা করেছিলেন। পুস্তকগুলির খ্যাতি এককালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীপতি কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না, অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ধীকোটি ও সিদ্ধান্তশেখর উভয় গ্রন্থই তাঁর উন্নত গণিত-জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে।

ভাস্করাচার্য

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি। ভারতে জ্যোতিষের মুকুটমণি সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর নাম ভাস্করাচার্য। কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানে নয়, অংকশাস্ত্রেও তাঁর নাম পৃথিবী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আনুমানিক ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড় গ্রামে মহাবিজ্ঞানী ভাস্করাচার্যের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। কথিত আছে, আপন প্রিয়তমা কন্যা লীলাবতী অকাল বৈধব্য বরণ করে পিতৃগৃহে ফিরে এলে ব্যথিত ভাস্করাচার্য কন্যার শিক্ষাদানের নিমিত্ত রচনা করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্তশিরোমণি। পুস্তকটি থেকে জানা যায় ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রিশ বছর বয়সে ভাস্করাচার্য এটি রচনা করেছিলেন। সিদ্ধান্তশিরোমণি চার খণ্ডে বিভক্ত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

পুস্তকটির গোলাধ্যায় ও গণিতাধ্যায় অংশে আলোচিত হয়েছে জ্যোতি-বিজ্ঞানের কথা। ভাস্করাচার্যই একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী যাঁর প্রতি বিশ্বের বিজ্ঞানসমাজ যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এই একটিমাত্র বিজ্ঞানীর কথা আলোচিত হলে পাশ্চাত্য সমালোচকরা নীরব হয়ে যান। ভাস্করাচার্যের প্রতিভাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। তাই সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্যের মত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী পৃথিবীর কোন দেশে বর্তমান ছিল না।

ইনিই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রথম আবিষ্কর্তা। সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন "পৃথিবী তার উপরিভাগের প্রতিটি পদার্থকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে।" পৃথিবী যে মহাশূন্যে ভাসমান এবং তার যে কোন আধার নেই একথাও তিনি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। গাণিতিক পদ্ধতিতে চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতেও সক্ষম হয়েছিলেন ভাস্করাচার্য। তাছাড়া অয়নাংশ নির্ধারণ, লম্ব নির্ণয়, গ্রহণ গণনা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

সিদ্ধান্তশিরোমণি একখানি মহাগ্রন্থ। আজও পর্যন্ত রচিত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির প্রথম দশখানির মধ্যে অক্লেশে সিদ্ধান্তশিরোমণিকে স্থান দেওয়া যায়। কেবল ভারতবর্ষে নয়, এই ধরনের গ্রন্থ পৃথিবীতে খুব কমই পাওয়া যাবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ভাস্করাচার্যের মৃত্যুর পর ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে নেমে এসেছে এক মহাঅন্ধকার যুগ। সে অন্ধকার বর্তমানে একটু পাতলা হয়ে এলেও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। ভাস্করাচার্যই প্রাচীন ভারতের শেষ প্রতিভাধর।

[বিঃ দ্রঃ—আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে 'প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।]

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি এবং পরিচয়

ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অতি প্রাচীন। এমন কি পৃথিবীর কোন দেশে যখন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন গবেষণা হয় নি তখনই এদেশে প্রচলিত ছিল এক উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই শাস্ত্রকে কতকগুলি উদ্ভিদ্ এবং দ্রব্যগুণের পরিচয় মনে করলে সম্পূর্ণ ভুল করা হবে। সুপ্রাচীন এই শাস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে মানুষের বিভিন্ন প্রকার রোগের কারণ ও নিরাময়ের উপায় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে আর আলোচিত হয়েছে শরীর বিদ্যা। মানব-শরীরের সমূহ যন্ত্রপাতি, রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা. হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তা দেখে বর্তমানের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানও বিস্ময় বোধ করবে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জানা যায়, সে যুগেও শিক্ষার্থীকে শব ব্যবচ্ছেদ করে হাতেনাতে শরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হত। শাস্ত্রটিতে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে শব ব্যবচ্ছেদের উপর। উন্নত শল্য চিকিৎসা পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে এই শাস্ত্রে এবং পরিচয় প্রদান করা হয়েছে শল্য চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বহু অস্ত্রশস্ত্রের। রোগ নির্ণয় ও শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সব সূক্ষ্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত তাতে মনে হয় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা সেযুগে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

শাস্ত্রটির নাম আয়ুর্বেদ হওয়ার কারণ, প্রাচীনকালে মানুষ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারত। পুরাণমতে বেদের সার আয়ুর্বেদ। কাশ্যপ সংহিতার রচনাকার মহামুনি কশ্যপের মতে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি বেদ রচনার পর যে পঞ্চম বেদ রচিত হয় তারই নাম আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেছেন, এই বিদ্যা লাভ করলে মানুষ নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারে। তাই এককালে সমাজ ও পরিবেশ উভয়কে সুস্থ ও সুন্দর করতে দরকার হত আয়ুর্বেদের। এইজন্যই মনে হয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আয়ুর্বেদ অবশ্যপাঠ্য ছিল এবং বেদের অপরাপর অংশের মত আয়ুর্বেদকেও

জানতে হত। পরবর্তীকালে উক্ত শাস্ত্রটির সঙ্গে ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও দর্শন স্থান লাভ করে।

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি মত প্রচলিত আছে। কথিত আছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন প্রজাপতিদের। প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করে শিক্ষা দেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ লাভ করেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র থেকে মহর্ষি ভরদ্বাজ—ভরদ্বাজ থেকে আত্রেয় এবং আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ এই বিদ্যা লাভ করেন। অগ্নিবেশের শিষ্যই মহাত্মা চরক, যাঁর সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে।

শাস্ত্র থেকে জানা যায় ব্রহ্মার উপদেশাবলী ছিল মূলতঃ কায়চিকিৎসা-প্রধান। অতি প্রাচীনকালে আরও এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেই পদ্ধতির নাম শল্য চিকিৎসা। এই চিকিৎসা শাখার প্রবর্তক ধন্বন্তরি। কেউ কেউ মনে করেন, ধন্বন্তরি সমুদ্র মন্থনে উদ্ভূত হয়েছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন, ইনি সুপ্রসিদ্ধ শল্য চিকিৎসক কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি। দিবোদাস ধন্বন্তরির শিষ্যই সুশ্রুত। গুরুর কাছ থেকে শল্যচিকিৎসা অর্জন করে সুশ্রুতই প্রথম প্রচার করেন পৃথিবীতে।

প্রাচীনকালে কোন কিছু লেখার প্রচলন ছিল না। শ্রুতিধর শিষ্যরা গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করে কেবলমাত্র মনেই গেঁথে রাখতেন কতকগুলো শ্লোকের মাধ্যমে। শিষ্যরা যখন সংসারে প্রবেশ করতেন তখন প্রয়োগ করতেন অধীত-বিদ্যা। আবার নিজেরাও বাস্তব জীবনের বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন। শেষ বয়সে নিজের অধীতবিদ্যা এবং অভিজ্ঞতা উভয়ই দান করে যেতেন প্রিয়তম শিষ্যদের। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছিল এই শাস্ত্র। কিন্তু এমন এক সময় এল যখন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে আসতে লাগল বহু তথ্য এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তখন যত শ্রুতিধর শিষ্যই হোক না কেন সব জিনিস মনে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠলো। সেই সময় লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন অনেকে। মহর্ষি অগ্নিবেশই প্রথম কায়-চিকিৎসক যিনি কায়-চিকিৎসার উপর রচনা করলেন একখানি সংহিতা, নাম অগ্নিবেশ সংহিতা। এদিকে শল্য চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত রচনা করলেন সুশ্রুত সংহিতা। এই দুই সংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং কালক্রমে এই

দুই সংহিতাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বহু সংহিতা গ্রন্থ। আসল অগ্নিবেশ সংহিতা বহুকাল পূর্বে লুপ্ত হয়ে গেছে। শোনা যায়, অগ্নিবেশ-শিষ্য চরক সংহিতাটির সংস্কার করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচনা করেন চরক-সংহিতা। সেটি এবং সুশ্রুত সংহিতা এখনও প্রচলিত। তবে বহুকাল ধরে বহু প্রতিভাধরের হাতে পড়ে সংহিতাগুলির পূর্বরূপ আর বজায় নাই। যদিও বহু তথ্য লুপ্ত হয়ে গেছে, তবুও অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন চরক ও সুশ্রুত সংহিতার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত সংহিতাগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সংহিতাগুলি থেকে জানা যায় প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মোট আট ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই বলা হয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। বিভাগগুলি নিম্নরূপ—

১। কায় চিকিৎসা বা উপযুক্ত ভেষজের সাহায্যে সমূহ দৈহিক রোগ নিরাময় ব্যবস্থা।

২। শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগ নিরাময় পদ্ধতি।

৩। শলাক্য চিকিৎসা বা চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও কণ্ঠের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার এবং বিকৃত অঙ্গের পুনর্গঠন।

৪। ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগ চিকিৎসা।

৫। কৌমার ভৃত্য বা শিশুরোগ চিকিৎসা এবং শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও প্রতিপালন বিধি।

৬। অগদতন্ত্র বা বিষচিকিৎসা।

৭। বাজীকরণ তন্ত্র বা প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা।

৮। রসায়ন তন্ত্র বা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে আবার দুটি খণ্ডে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম খণ্ড শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক; দ্বিতীয় খণ্ড রোগ ও তার চিকিৎসা বিষয়ক। প্রথম খণ্ডটিই সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক। এই খণ্ডে শরীর সংক্রান্ত এমন কিছু কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা আজকের দিনে প্রচলিত উন্নত শরীর বিজ্ঞানও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অংশে দেখা যায় শরীরের হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পরিচয়। সেই সঙ্গে এদের উপাদান, গঠনপ্রণালী এবং কার্যপ্রণালী। মোটামুটি সেকালের পক্ষে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত আকারে শরীর ও তার বিভিন্ন অংশের পরিচয় প্রদান

করা হয়েছে, তা ছাড়া রক্ত সংবহনতন্ত্র, পরিপাক ক্রিয়া, মল-মূত্রাদির বিবরণ, গন্ধ বর্ণ স্পর্শ প্রভৃতি আমাদের মস্তিষ্কে কেমন অনুভূতি জাগায় তারও বর্ণনা পাওয়া যায় এই অংশটিতে। আরও দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—একটি মনোবিজ্ঞান, অপরটি দ্রব্যগুণ। মানুষের বহু রোগ যে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ একথাও চরক সুশ্রুতের আমলে জানা ছিল। মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সে যুগে বহু ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং চিকিৎসককে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করতে হত। মানসরোগ চিকিৎসার জন্য পাতঞ্জল দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনে বিস্তৃত আলোচনা আছে। দ্রব্যগুণ পরিচয়ের ক্ষেত্রে কতকগুলি ভেষজের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে, আর আলোচিত হয়েছে খাদ্যের কথা। কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ নয়, খাদ্যের সম্বন্ধে বহু প্রাচীন মত ভারতে প্রচলিত। আহার শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হয়। কোন্ খাদ্য শরীরের পক্ষে হিতকর, কোন্‌টি অহিতকর, কোন্ খাদ্য গ্রহণ করলে কি কি রোগ হয়ে থাকে, অপুষ্টির অভাবে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, এ সবই আলোচিত হয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

মনে হয়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচিত হওয়ার অনেক আগে আহারের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছিল ভারতবর্ষে। পরবর্তীকালে ভগবান শঙ্করাচার্য এবং রামানুজাচার্য আহার সম্বন্ধে স্বীয় মত পোষণ করে গেছেন। শাঙ্করভাষ্য অনুযায়ী বিশুদ্ধ আহারের ফলে শরীরের ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কর্ম-সম্পাদনে সক্ষম হয়। রামানুজাচার্য খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে উত্তেজক দ্রব্য আহারে মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। ময়লা, কীটদষ্ট এবং বাজারের খাদ্যগ্রহণে মন অপবিত্র হয় ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আলোচিত খাদ্যের গুণাগুণ সেইজন্য তার নিজস্ব নাও হতে পারে। প্রাচীন মতামতগুলিই বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র।

বর্তমানের মত সেকালেও শিক্ষার্থীদের ওষুধ প্রস্তুতির বিধি ও ওষুধের ফরমুলা মুখস্থ করতে হত। তখন রাসায়নিক ওষুধ ছিল খুবই কম তবুও যেগুলি প্রচলিত ছিল তাদের প্রস্তুতপ্রণালী এবং সেবনবিধি জানতে হত। সবচেয়ে বেশী পরিচিত হতে হত কতকগুলো উদ্ভিদের মূল, পাতা, ফুল, বীচি প্রভৃতির সঙ্গে। এইগুলি ছিল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান।

চিকিৎসা খণ্ডের আলোচ্য বিষয় রোগ পরিচয় ও নিরাময় ব্যবস্থা। প্রাচীন

আয়ুর্বেদাচার্যগণ শারীরিক ব্যাধিকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন : (১) স্বাভাবিক ব্যাধি, (২) আগন্তুক রোগ, (৩) সংক্রামক ব্যাধি। স্বাভাবিক ব্যাধি বলতে তাঁরা বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনটি জিনিসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষ নামে খ্যাত। তাঁদের ধারণা যে কোন কায়িক ব্যাধি ঐ ত্রিদোষ থেকে উৎপন্ন হয়। তাঁরা আরও মনে করতেন, মানবমনের তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; শরীরের তিনটি দোষ বায়ু, পিত্ত ও কফ। ত্রিদোষজনিত স্বাভাবিক রোগ বলতে জ্বর, অজীর্ণ, অম্ল, কাশি প্রভৃতিকে নির্দেশ করেছেন। সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা বর্তমানের প্রায় অনুরূপ। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি যে সব রোগ অন্য রোগাক্রান্ত শরীর থেকে সুস্থ শরীরে সংক্রামিত হয় সংক্ষেপে তারাই ছিল সংক্রামক রোগ। আগন্তুক রোগ বলতে তাদের বোঝাত, যে সব রোগ হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে উৎপন্ন হত। যেমন অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা, পতন প্রভৃতির ফলে জাত রোগ।

এবার আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদান করা হল।

কায়-চিকিৎসা

আয়ুর্বেদ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রতি অধিকতর জোর দিয়েছে। ঐ ত্রিদোষ রোগ উৎপত্তির কারণ তো বটেই অধিকন্তু ঐ তিনটির যে কোন একটির আধিক্য ঘটলে সুস্থ শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটায়। আয়ুর্বেদ মতে বায়ু-প্রকৃতির মানুষের মধ্যে অপুষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। বায়ুপ্রকৃতির মানুষের মাথার চুল হয় রুক্ষ, দেহ ও মনে লক্ষ্য করা যায় দৃঢ়তার অভাব, অতি সাধারণ কারণে এরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পিত্তপ্রকৃতির মানুষের দেহ ও মনের গঠন সম্পূর্ণ নয়। দেহের অস্থি ও মাংসপেশী সুদৃঢ় থাকে না। কষ্টসহিষ্ণু হলেও দেহ-মনে অবসাদ বোধ করে। কারণে অকারণে এদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখা যায় ; দ্রুত বার্ধক্য এসেও ভর করে। কফপ্রকৃতির মানুষেরাই দেহ মনে অত্যন্ত সুগঠিত। চলাফেরা, আহার বিহার, কথাবার্তায় এরা সংযত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম, দুঃখশোক, কিছুই ওদের কাবু করতে পারে না। ওরা দীর্ঘদেহী, দেহের ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ।

আয়ুর্বেদ মতে একমাত্র বায়ুর প্রকোপই শারীরিক অস্বাস্থ্যের মূল কারণ।

সেইজন্য বায়ুর উপরই সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বায়ুরোগের মূল কারণ বলা হয়েছে শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধা, মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি। চরক বায়ু, পিত্ত ও কফের স্থানও নির্ণয় করে গেছেন। তাঁর মতে মলাশয়, বস্তিদেশ ও পদযুগল বায়ুর স্থান; শোণিত, স্বেদ, লসিকা ও আমাশয় পিত্তের স্থান; মস্তিষ্ক, গ্রীবা, মেদ ও বক্ষোদেশ কফের স্থান। বায়ু, পিত্ত ও কফের চিকিৎসাই মূলতঃ কায়-চিকিৎসা নামে খ্যাত।

কায়-চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেকগুলি পুস্তক এককালে প্রচলিত ছিল। সে-গুলির মধ্যে অগ্নিবেশ সংহিতা, ভেল সংহিতা, জতুকর্ণ সংহিতা, পরাশর সংহিতা, হারীত সংহিতা ও বিশ্বামিত্র সংহিতা প্রধান। পূর্বে বলা হয়েছে, মহর্ষি চরক অগ্নিবেশ সংহিতার সংস্কার করে চরক সংহিতা রচনা করেন। অগ্নি-বেশ সংহিতা অপেক্ষা চরক সংহিতা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কালক্রমে অগ্নিবেশ সংহিতা লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও মনে হয়, এই সংহিতাখানি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশ সংহিতা থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন। ভেল সংহিতাও কায়-চিকিৎসার একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক রূপে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। অনেক পরে মহর্ষি বাগ্‌ভট ভেল সংহিতাকে অবলম্বন করে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। ভেল সংহিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, এতে শল্যতন্ত্রের কথা আলোচিত হয়েছে। ভেল, সুশ্রুতের পূর্ববর্তী বলে অনেকে মনে করেন।

জতুকর্ণ সংহিতার রচয়িতা জতুকর্ণ, পরাশর সংহিতার রচয়িতা পরাশর, হারীত সংহিতার রচয়িতা হারীত এবং বিশ্বামিত্র সংহিতার রচয়িতা বিশ্বামিত্র। এঁরা সবাই প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ ঋষি বলে পরিচিত।

শল্য চিকিৎসা ও শলাক্য চিকিৎসা

শল্য চিকিৎসা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক পরম বিস্ময়। কথিত আছে, স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় শল্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ধন্বন্তরি এবং তৎশিষ্য সুশ্রুতের দ্বারা এই বিদ্যা বিস্তার লাভ করে, সুশ্রুত সংহিতায় অন্ততঃ চৌদ্দ রকমের ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা আছে। কোন কারণে দেহের কোন অস্থি স্থানচ্যুত হয়ে গেলে সেগুলি পুনঃ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হত। যুদ্ধে আহত যোদ্ধাদের দেহে বিদ্ধ তীর বা বল্লমের আঘাত শল্য চিকিৎসার দ্বারা নিরাময়

করা হত। শরীরের কোন স্থানের দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য জলোকা বা জোঁকের সাহায্য নেওয়া হত। এখনও কোন কোন চিকিৎসক জলোকার দ্বারা চিকিৎসা করে থাকেন। উদরী প্রভৃতি রোগে ছিদ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় জল বহিষ্কারের নিয়ম ছিল। শল্য চিকিৎসার সবচেয়ে বিস্ময়কর অঙ্গ ছিল পঙ্গু অঙ্গের পুনর্গঠন পদ্ধতি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাকে প্ল্যাসটিক সার্জারী বলা হয় ঠিক সেই ধরনের একটি পদ্ধতি তখনও অনুসরণ করা হত। এই পদ্ধতিকে বলা হত শল্যতন্ত্র পদ্ধতি। কথিত আছে, গাল থেকে ত্বক কেটে নিয়ে কর্তিত নাসা বা কর্ণের পুনর্গঠন করা হত। এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন, এমনকি ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও প্রচলিত ছিল বলে অনেকের অনুমান। আজ থেকে মাত্র দু-শ বছর আগেও কোন কোন ভারতীয় চিকিৎসক কর্তিত নাসা কর্ণের পুনর্গঠন করতে পারতেন। এই প্রণালী ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল বলে আজও চিকিৎসা শাস্ত্রে কর্তিত নাসার পুনর্গঠন পদ্ধতিকে "ইণ্ডিয়ান রাইনো প্ল্যাসটি" নামে অভিহিত করা হয়।

শল্য চিকিৎসার আর একটি অঙ্গ ছিল প্রসূতিবিদ্যা। প্রসূতির তলপেটে অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের জানা ছিল। কোন কোন চিকিৎসক প্রসূতিকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করতেও সমর্থ হতেন। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে অজ্ঞান করানোর নিয়ম ছিল। তবে কীভাবে তাঁরা অজ্ঞান করাতেন সে পদ্ধতি জানা যায় না। অথচ এই পদ্ধতি শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতি আধুনিক কালের অবদান। চক্ষু চিকিৎসা ও চোখে লেন্সের ব্যবহার বিধি প্রচলিত ছিল বলে অনুমিত হয়। চোখে ছানি পড়লে অস্ত্রোপচারের দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা হত। কিন্তু চক্ষু অধিরোপণ পদ্ধতি সংহিতাগুলিতে দেখা যায় না। বেদ পুরাণের কাহিনীগুলি থেকে কেবলমাত্র অনুমান করা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে চক্ষু অধিরোপণ প্রণালী জানা ছিল।

মোটকথা সুশ্রুত আমলের শল্য-চিকিৎসার সঙ্গে বর্তমানকালের শল্য-চিকিৎসার বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। সুশ্রুত সংহিতা, ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠের পুস্তকে আরও এক ধরনের শল্য-চিকিৎসার উল্লেখ আছে। সেই চিকিৎসাকে বলা হত শলাক্য চিকিৎসা। চক্ষু, কর্ণ, নাসা এবং কণ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে অস্ত্রোপচার এই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শল্য চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক সুশ্রুত সংহিতা। ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠ

উভয়েই সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার। তা সত্ত্বেও এ'দের পুস্তকে শল্য-চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য দৃষ্টিগোচর হয়। শল্য-চিকিৎসার আর একখানি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক ভোজ সংহিতা। রচয়িতা ভোজ মুনি, ইনি ধারা নগরীর ভোজরাজা নন।

কৌমার ভৃত্য

শিশুরোগ, শিশুরোগের কারণ এবং চিকিৎসা কৌমার ভৃত্যের অন্তর্গত। শিশুদের সুস্বাস্থ্য লাভের উপায়ও বর্ণিত হয়েছে এই অংশে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এটি একটি অঙ্গ হলেও কৌমার ভৃত্যের জন্য পৃথক পুস্তকও রচিত হয়েছিল। এই থেকে মনে করা যেতে পারে যে, তৎকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক-একটি শাখায় এক-একজন বিশেষজ্ঞও ছিলেন।

কৌমার ভৃত্যের দুখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। একখানি বৃদ্ধ-জীবকতন্ত্র এবং অপরখানি কাশ্যপতন্ত্র। এই দুখানি পুস্তক ছাড়া আরও কয়েকখানি পুস্তক রচিত হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। সেগুলি বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে।

অগদতন্ত্র

অগদতন্ত্রের আর একটি নাম বিষ চিকিৎসা। শরীরে কোনও প্রকার বিষক্রিয়া হলে তাকে কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে, এই বিভাগে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্পবিষ চিকিৎসা, কুকুর, বেড়াল, শেয়াল ইত্যাদি জীব-জন্তুর কামড়ে যে বিষক্রিয়া হয় সে সমুদয়ই এই অগদতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সর্প-বিষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাশ্যপ সংহিতা ও সনক সংহিতায় দেখা যায় অতি উৎকট ও বিষাক্ত ওষুধ যথাসময়ে এবং যথামাত্রায় রোগীকে প্রয়োগ করা হত। সব রকমের বিষাক্ত জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ অগদতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

রসায়ন চিকিৎসা

আয়ুর্বেদে রসায়ন চিকিৎসা অংশে আছে কতকগুলি ধাতুজাত ওষুধের বর্ণনা ও গুণাগুণ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করে আসছে। বৈদিক যুগেও দেখা যায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতু ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। সংহিতাগুলিতে মকরধ্বজ, কয়েক রকমের কজ্জলী,

রসসিন্দুর, লৌহভস্ম, পারদভস্ম, স্বর্ণভস্ম ও শোধিত ধাতুকে রোগ নিরাময় এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উপায় বলে বর্ণিত হয়েছে। রাসায়নিক ওষুধ সমূহের আবিষ্কর্তা হিসাবে পতঞ্জলি ও নাগার্জুনের নাম প্রসিদ্ধ। নাগার্জুন সেঁকো বিষ বা আর্সেনিককে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার অনেকের মতে সেঁকো বিষের প্রচলন নাগার্জুনের পূর্বেও ছিল।

রাসায়নিক চিকিৎসার জন্যও পৃথক পৃথক বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। নাগার্জুনের পূর্ববর্তীকালে বহুল প্রচারিত সংহিতাগুলিতেও কিছু কিছু রাসায়নিক ওষুধের নাম পাওয়া যায়।

ভূতবিদ্যা

ভূতবিদ্যা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একটি বিস্ময়কর অংগ। সাধারণ মানুষ একরকমের অসুখকে 'ভূতে পাওয়া' আখ্যা দিয়ে থাকে। এই ভূতে পাওয়াকে চরক ও সুশ্রুত মানসিক রোগ বলে বর্ণনা করেছেন, আচার্য বাগ্‌ভটের মতও তাই। তাঁদের ধারণা মানুষ ভয় পেলে, মূর্চ্ছা গেলে অথবা কোনও প্রকার মানসিক বিকার ঘটলে ভূতাবিষ্টের মত ব্যবহার করে। সেদিনের চিকিৎসাশাস্ত্রও ভূতে পাওয়ায় বিশ্বাস করত না। প্রকৃতপক্ষে মানসিক রোগের উৎপত্তি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ভূতবিদ্যার অন্তর্গত ছিল।

ভূতবিদ্যার জন্য কোন পৃথক পুস্তক রচিত হয়নি। প্রাচীন কয়েকটি দর্শনে মনোবিজ্ঞানের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। চরকেও মনোবিজ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে। মানসিক রোগের পরিচয় চরক ও সুশ্রুত উভয়েই বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করেছেন।

বাজীকরণ

বন্ধ্যাত্ব নিবারণ, প্রজননক্ষমতা লাভ, বীর্যধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি এই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। সংহিতাগুলিতে বাজীকরণতন্ত্রের আলোচনা থাকলেও বাজীকরণের জন্য পৃথক পুস্তক রচিত হয়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্রে এই চিকিৎসার কথা কিছু কিছু উল্লেখ আছে। কুচুমারতন্ত্র ও শ্বেতকেতুতন্ত্র এই জাতীয় চিকিৎসার প্রামাণিক গ্রন্থ।

কথিত আছে, একদিন দেবাদিদেব মহাদেব গৌরীকে সহস্রঅধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন। মহাদেবের অনুচর নন্দী গোপনে শ্রবণ করে মহাদেবের মুখনিঃসৃত বাণী জনসমাজে প্রচার করেন। শ্বেতকেতুই সুবৃহৎ কামসূত্রকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেন। শ্বেতকেতুতন্ত্রের রচয়িতা উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু। অপর একখানি পুস্তক কুচুমারতন্ত্রও বেশ প্রাচীন। অনেকে আবার মনে করেন, কুচুমারতন্ত্রকে অবলম্বন করে বাৎসায়ন কামসূত্র রচনা করেছিলেন। বাৎসায়নও একজন ঋষি। কেউ কেউ মনে করেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যই বাৎসায়ন। এই মত ঠিক নয় বলে মনে হয়; তবে সঠিক কিছু বলাও যায় না।

সে যুগে আয়ুর্বেদশাস্ত্র কেবলমাত্র মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হত না, গৃহপালিত পশুপাখি এমনকি বৃক্ষলতার চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদকে প্রয়োগ করা হত। পশুদের চিকিৎসার জন্য এককালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিন্তু সবগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে জানা যায়, গবাদি পশুদের চিকিৎসার জন্য মহর্ষি গৌতম রচনা করেছিলেন গৌতম সংহিতা; হস্তিরোগ চিকিৎসার জন্য মহর্ষি পালকপ্যের উপদেশ লিপিবদ্ধ করে পালকপ্য সংহিতা নামে প্রচার করেছিলেন রাজা লোমপাদ; অশ্বরোগ চিকিৎসার জন্য মহর্ষি শালিহোত্র রচনা করেছিলেন শালিহোত্র সংহিতা।

শালিহোত্র সংহিতা এককালে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। আমরা জানি, আরবের আদিবাসিগণ প্রথম থেকেই অশ্ব প্রতিপালন করে আসছেন। তাই একদিন শালিহোত্র সংহিতা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। বহুবার বহুজন কর্তৃক আরবী ভাষায় শালিহোত্র সংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনা খ্রীষ্টজন্মের বেশ কয়েকশ বছর আগে। আরববাসীরা অনুবাদটির নামকরণ করেছিলেন শালাটোর, দীর্ঘকাল ধরে বইটি বিদেশীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল কিন্তু আসল পুস্তক এবং তার অনুবাদ দুইই আজ লুপ্ত।

বৃক্ষলতাদিও আয়ুর্বেদের আওতার বাহিরে ছিল না। গাছপালাও আমাদের মত সুখে আনন্দিত হয়, দুঃখে হয় ম্রিয়মাণ, রোগ ব্যাধিতে জর্জরিত হয়, একথা প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের অজানা ছিল না। বৃক্ষের প্রাণ আছে এবং বৃক্ষই মানুষের পরম বন্ধু—বৈদিক যুগেই ভারত টের পেয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল উদ্ভিদের চিকিৎসা পুস্তক বৃক্ষায়ুর্বেদ। বৃক্ষায়ুর্বেদের

রচয়িতা শার্ঙ্গধর। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে শার্ঙ্গধর নামে এক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। অনেকের মতে, কবি শার্ঙ্গরধ এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ রচয়িতা শার্ঙ্গধর একই ব্যক্তি। এ বিষয়ে কোন কিছু বলা যায় না, তবে উভয়ে পৃথক ব্যক্তি বলেও কিছু লোকের বিশ্বাস।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আর এক বিস্ময় রোগ-জীবাণুর কথা বর্ণনা। 'জীবাণু' কথাটি ব্যবহার না করে বলা হয়েছে 'অদৃশ্য কৃমি'। সংক্রামক ব্যাধি যথা যক্ষ্মা, চোখ ওঠা প্রভৃতি রোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ অদৃশ্য কৃমির কথা উত্থাপন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, সে যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি। তা সত্ত্বেও চিকিৎসকগণ উপলব্ধি করেছিলেন রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ। অথচ এই জীবাণুকে নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে অনেক পরে ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার এবং জীবাণুতত্ত্ববিদ লুই পাস্তুরের দ্বারা।

আয়ুর্বেদের শাস্ত্রকার

প্রাচীন ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ধারক ও বাহক ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ। কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকটি শাখার উদ্ভাবক এবং গবেষক তাঁরাই। সে সব ঋষিদের কিছু কিছু পরিচয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আয়ুর্বেদের নবযুগ আরম্ভ হয়েছে সুশ্রুত ও চরকের সময় থেকে। অতি প্রাচীনকালের আয়ুর্বেদাচার্যগণের কথা আলোচনা না করে চরক সুশ্রুত থেকেই আলোচনা করা হল।

মহর্ষি চরক

মহর্ষি চরক প্রাচীন ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে আজও সারা ভারত আলোকিত। এই চরক যে কে ছিলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলার উপায় নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক চরকের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন পাণিনির সূত্রে উল্লিখিত চরক যিনি পাণিনিরও পূর্ববর্তী। কিন্তু যে চরক অগ্নিবেশের শিষ্য এবং যিনি অগ্নিবেশ সংহিতাকে সংস্কার করে চরক সংহিতা রচনা করেছিলেন সে চরক পাণিনি বর্ণিত চরক নন। গবেষকগণ বিভিন্ন উপাদান থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে মনে হয় অগ্নিবেশ পাণিনির পরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর একজন চরকেরও নাম পাওয়া যায়। ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাট মহামতি কণিষ্কের রাজবৈদ্য। যদিও কণিষ্কের পরবর্তীকালেই চরক সংহিতার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবুও রাজবৈদ্য চরক এবং সংহিতাকার চরক পৃথক ব্যক্তি বলে অনেকের অনুমান। তাঁদের একটা বড় যুক্তি, এতবড় মহামনীষী যে চরক, যাঁর খ্যাতিতে সারা ভারত মুখর ছিল, সেই চরকের কথা কল্হন্ তাঁর রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে উল্লেখ করেননি কেন? অথচ কল্হন্ কণিষ্কের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ছোট-বড় বহু রাজপুরুষের কথাও তিনি বাদ দেননি।

ধারেশ্বর ভোজ, পণ্ডিত ভাবমিশ্র প্রভৃতি মনে করতেন ভগবান পতঞ্জলিই মহর্ষি চরক। তাঁদের এই মতকে সমর্থন করছেন আজকের কিছু কিছু ভারতীয়

পণ্ডিত। সেই কারণে আমরাও মনে করতে পারি ভগবান পতঞ্জলিই মহর্ষি চরক। (পতঞ্জলির কথা পরে বর্ণনা করা হল)।

চরকের সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁর অমূল্য দান চরক সংহিতা চিরকাল ভারতবাসী শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। চরক সংহিতাই একমাত্র ভারতীয় পুস্তক যেটি এককালে বিশ্বের সবকটি সভ্যদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় চরক সংহিতা কোন দিন রচিত হবে না।

সুশ্রুত

কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরির শিষ্য এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত একাধারে কায়চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসক ছিলেন। সুশ্রুতই প্রকৃতপক্ষে শল্য-চিকিৎসার প্রবর্তক। পিতৃপরিচয় থেকে মনে হয় সুশ্রুত বৈদিক যুগের লোক এবং মহাভারত রচনার পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চরক সংহিতার পরেই সুশ্রুত সংহিতার স্থান। এখানিও সারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আজও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এই দুই সংহিতার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

জীবক

জীবক বৌদ্ধ যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। তিনি ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বুদ্ধভক্ত। মহান সম্রাট বিম্বিসারের প্রধান উপদেষ্টা এবং রাজচিকিৎসক। বিম্বিসারের পর অজাতশত্রু জীবককে বুদ্ধভক্ত জেনেও ঐ পদে বহাল রেখেছিলেন। জীবকের মত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধভক্ত খুব কমই আছে। অন্যদিকে জীবকের ছিল অসাধারণ রোগনিরাময় ক্ষমতা। কিংবদন্তী এই, জীবক রোগীকে দেখেই রোগ চিনতে পারতেন। কোনো রোগ তাঁর কাছে দুরারোগ্য ছিল না।

জীবক ছিলেন মহারাজ বিম্বিসারের পালিত পুত্র। রাজগৃহের বারবণিতা শালবতীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারা জীবনটা ছিল তাঁর ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ। তথাপি শেষ বয়সে "বৃদ্ধ জীবকতন্ত্র" নামে একখানি চিকিৎসাশাস্ত্র লিখে গেছেন। বৃদ্ধ জীবকতন্ত্র শিশুরোগ চিকিৎসার এক অনবদ্য পুস্তক।

আচার্য দৃঢ়বল

চরক সংহিতা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন চিকিৎসক ও টীকা-কারদের হাতে পড়ে সংহিতাটির অঙ্গহানি ঘটেছিল। কোথাও হয়েছিল সংযোজন,

আবার কোন কোন জায়গায় অতীব মূল্যবান তথ্যকেও বাদ দেওয়া হয়েছিল। কয়েকশ বছর পরে চরক সংহিতার সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে পড়ল। সেই সময় বহু মনীষী চরক সংহিতার সংস্কার করার কথা চিন্তা করলেও এই দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করতে কেউ সাহসী হননি। শেষে আয়ুর্বেদাচার্য দৃঢ়-বলের চেষ্টায় ও যত্নে চরক সংহিতার নবরূপায়ণ ঘটল। দৃঢ়বল ছিলেন একদিকে সুচিকিৎসক, অপরদিকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই তিনি কেবল চরক সংহিতাকে সংস্কার করে ক্ষান্ত হননি, নবাবিষ্কৃত বহু তথ্যও তাতে যোজনা করেছিলেন। বর্তমানে চরক সংহিতা নামে প্রচলিত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে চরক ও দৃঢ়বল উভয়েরই রচনা। তবে কোন্ অংশটি যে চরকের লেখা এবং কোন্‌টি দৃঢ়-বলের সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। যে চরক সংহিতাখানি দেশ-বিদেশ থেকে এত সম্মান সংগ্রহ করেছিল সেটিও ছিল আচার্য দৃঢ়বলের দ্বারা সংস্কার করা চরক সংহিতা। অনেকে মনে করেন, দৃঢ়বল কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর একদল পণ্ডিতের মতে তাঁর জন্মস্থান পাঞ্জাব। তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। আবার চরক সংহিতার সংস্কার ছাড়া অপর কোন নতুন বইও রচনা করেননি। তাহলে হয়ত সেই যুগের রীতি অনুযায়ী নিজের পরিচয়টা পুস্তকমধ্যে প্রদান করতেন। এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, আচার্য দৃঢ়বল পতঞ্জলির বহু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন চরক সংহিতার সংস্কারক হিসাবে।

আচার্য বাগ্‌ভট

আচার্য দৃঢ়বলের পর কেটে গেল আবার কয়েকশ বছর। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হল চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতার অনুরূপ আরও বহু সংহিতা। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল বলে কিছু কিছু অজ্ঞাত-নামা লেখক নিজেদের বইকে চরক সংহিতা বা সুশ্রুত সংহিতা নাম দিয়ে চালাতে লাগলেন। ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল যখন আসল চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা চেনার কোন উপায় রইল না। কেবলমাত্র তাই নয়, চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা এবং আরও কয়েকখানি জনপ্রিয় সংহিতা গ্রন্থ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল। মধ্যযুগে সেই সব লুপ্তপ্রায় গ্রন্থকে পুনরুদ্ধার করতে বহু পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন

ছিলেন আচার্য বাগ্‌ভট। সুদীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলি উদ্ধার করে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি এবং নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে এক মহান আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ। পুস্তকখানি মূলতঃ চিকিৎসা সংগ্রহ সার। আজও পুস্তকখানির সমাদর সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ থেকে লেখক সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্য জানা যায়। লেখক নিজেকে বলেছেন বাগ্‌ভট, জন্মস্থান সিন্ধুদেশ এবং পিতার নাম সিংহগুপ্ত।

বাগ্‌ভট সম্বন্ধে অপরাপর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় তিনি যৌবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু অবলোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মনে হয় তিনি পূর্বে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরও উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহত রেখে-ছিলেন।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎসিং-এর বিবরণীতে একজন বাগ্‌ভটের উল্লেখ আছে। এই বাগ্‌ভট নালন্দার একজন আচার্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। ইনি ঈৎসিং-এর গুরুও ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, ঈৎসিং-এর গুরু বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহের রচয়িতা বাগ্‌ভট একই ব্যক্তি। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বাগ্‌ভট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ ঈৎসিং-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করার পর পদব্রজে রাজগৃহ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সময় নালন্দার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈৎসিং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। একদিন ছাত্ররূপে উপস্থিত হয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, "তরুণ আচার্য বাগ্‌ভটের" পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তরুণ আচার্য আবার চিকিৎসাশাস্ত্রেও ছিলেন সুপণ্ডিত। বাগ্‌ভটের চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ঈৎসিংকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে অনুপ্রেরণা দেয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন। ঈৎসিং ২২ বছর কাল ভারতে ছিলেন, তারপর সেই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিবরণী থেকে অনুমান করা হয় বাগ্‌ভট দীর্ঘকাল নালন্দার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আচার্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ। ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স পঞ্চাশও অতিক্রম করেনি। ঈৎসিং বাগ্‌ভট-রচিত কোন পুস্তকের নামোল্লেখ করেননি। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ তাই তাঁর শেষ বয়সের রচনা। কত খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকটি রচিত হয়েছে সেকথাও উল্লেখ করেননি বাগ্‌ভট।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ ছাড়াও অষ্টাঙ্গহৃদয় নামে আর একখানি গ্রন্থের রচয়িতা বাগ্‌ভট। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে অষ্টাঙ্গহৃদয় অপর এক বাগ্‌ভটের লেখা। ভারতীয় গবেষকগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা দেখেছেন দু-খানি পুস্তকেই ভাষাগত মিল যথেষ্ট আছে। উভয় পুস্তকের লেখক নিজেকে সিংহগুপ্তের পুত্র বলেও বর্ণনা করেছেন। তবে আর একজন বাগ্‌ভটের আবির্ভাব অবশ্য হয়েছিল। তাঁর রচনা "রসরত্ন সমুচ্চয়" নামে একখানি পুস্তক। ইনি অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে দু-জন বাগ্‌ভটের নাম পাওয়া যায় বলে, নালন্দার আচার্য এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহের রচয়িতাকে "বৃদ্ধ বাগ্‌ভট" নামে অভিহিত করা হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ পুস্তকটি সুবৃহৎ ও সুমহান। পুস্তকখানি ছ'ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলি যথাক্রমে সূত্রস্থান, শরীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান। গ্রন্থটিতে শল্য চিকিৎসার কথাও বর্ণিত হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং গদ্য পদ্যময়। তাঁর পুস্তকখানি তত্ত্ব কিংবা কবিত্বের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। বাগ্‌ভট যা বলতে চেয়েছেন তা সব জায়গায়ই স্পষ্ট। পুস্তকখানির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসক উভয়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠে।

গ্রন্থখানির আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভূতবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা। এত বিস্তৃত আলোচনা চরক, সুশ্রুত কোথাও নেই। বাগ্‌ভট ভূতাবেশকে উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাগ্‌ভট্ট অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ এককালে সারা ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

নাগার্জুন

আচার্য দৃঢ়বল যেমন চরক সংহিতার সংস্কার করেছিলেন ঠিক সেইভাবে নাগার্জুন সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার করেছেন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রসশাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মা নাগার্জুনের পরিচয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মাধবকর

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সব বাঙালী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক রচনা করে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবকর অন্যতম। মাধব ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "রুগবিনিশ্চয় এর" খ্যাতি এককালে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, আরব পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফা হারুণ অল্ রসিদের আগ্রহাতিশয্যে রুগবিনিশ্চয় বা মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। চরক ও সুশ্রুত সংহিতার পর যে সব আয়ুর্বেদ পুস্তক বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেগুলির মধ্যে মাধবের রুগবিনিশ্চয়ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মাধব তাঁর বইতে কিছু কিছু বাগ্‌ভটের বচন উদ্ধৃত করেছেন বলে সবাই মনে করেন মাধব বাগ্‌ভটের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে তিনজন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শ্রীমাধব, আর একজন মাধবাচার্য এবং শেষজন মাধবকর। মাধবকর, শ্রীমাধব ও মাধবাচার্য থেকে পৃথক ব্যক্তি। শ্রীমাধব সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার এবং তাঁর আবির্ভাবকাল মাধবকরের বহু পূর্বে। আর মাথবাচার্য অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি, আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। অর্থাৎ মাধবাচার্য মাধবের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীমাধব এবং মাধব দুজনেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রকার কিন্তু মাধবাচার্য কোন আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেননি বলে অনেকের বিশ্বাস। মাধবাচার্য আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ না হলেও প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের গুরু এবং প্রধানমন্ত্রী। ভারতপ্রসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদের ভাষ্যকার মহাত্মা "সায়নের" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম সায়ন এবং মাতা শ্রীমতী। শৈশবে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন এবং দীর্ঘকাল শৃঙ্গেরীর মঠে অতিবাহিত করেন। এই

সময় তিনি পরিচিত হন বিদ্যারণ্য স্বামী নামে। মাধবাচার্যের আর একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কবি ভোগনাথ। মাধবাচার্য নিজেও একাধিক বিষয়ে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বদর্শনসংগ্রহ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, পঞ্চদশী, উপনিষদের টীকা এবং শঙ্করবিজয় প্রধান। মাধবাচার্যকে ভারতের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, সেই সঙ্গে তাঁর দুই ভ্রাতা সায়ন ও কবি ভোগনাথকে। মাধব বা মাধবকরের এমন বহুমুখী প্রতিভা ছিল না। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন রুগবিনিশ্চয় বা মাধব-নিদানের জন্য। আর একখানি গ্রন্থও মাধবের নামে প্রচলিত। সেটির নাম "রত্নমালা"। রত্নমালা গ্রন্থখানি কতকগুলি দ্রব্যগুণের পরিচয় মাত্র।

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত, নৈয়ায়িক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। বারেন্দ্র-ভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে চক্রপাণির জন্ম হয়। পিতার নাম নারায়ণ দত্ত গৌড়াধিপতি নয়পালদেবের সমসাময়িক। শোনা যায়, নারায়ণ দত্ত মহারাজ নয়পালদেবের রাজচিকিৎসক ও রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।

চক্রপাণিদত্ত ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তবুও তাঁর সবচেয়ে বেশী খ্যাতি চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করার জন্য। চক্রপাণি অনেকগুলি চিকিৎসাশাস্ত্রের রচয়িতা ও টীকাকার। তন্মধ্যে "চিকিৎসা-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। পুস্তকটি তাঁকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে চিকিৎসাসংগ্রহকে লোকে "চক্রদত্ত" নাম দিয়েছিল। গ্রন্থটিতে তিনি বাগ্‌ভট ও সুশ্রুত থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন। চক্রদত্তের খ্যাতি একসময় ভারতের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

চক্রপাণিদত্তের অপর প্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থগুলির মধ্যে চরক সংহিতার উপর লেখা "চরকতত্ত্ব-প্রদীপিকা" এবং সুশ্রুত সংহিতা অবলম্বনে লেখা "ভানুমতী" প্রধান। এই দুইখানি পুস্তকও তাঁর অসামান্য জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন চরক চতুরানন ও সুশ্রুত সহস্রানন। মাধবের রুগবিনিশ্চয়ের উপর তাঁর টীকাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চক্রপাণিদত্তের সঙ্গে মহারাজ নয়পালদেবের নাম যুক্ত বলে পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন যে তিনি একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। চক্রপাণির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি

ভারতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। শেষ বয়সে তিন জন্মভূমি ময়ূরেশ্বর গ্রামে অতিবাহিত করেছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র গবেষণায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

চক্রপাণিদত্ত এবং মাধবকর ছাড়াও আরও কয়েকজন বাঙ্গালী চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্গসেন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাস প্রধান। বঙ্গসেন লুপ্তপ্রায় অগস্ত্য সংহিতাকে সংস্কার করে পুনঃপ্রচার করেছিলেন। বিজয়রক্ষিত এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত উভয়ে মাধবনিদানের টীকাকার। শ্রীকণ্ঠদত্ত নিজেকে বিজয়রক্ষিতের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। উভয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

শিবদাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি চক্রদত্তের টীকাকার এবং চরক সংহিতার উপরও টীকা লিখে গেছেন।

পণ্ডিত ভাবমিশ্র

ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। এমনকি মোগলসম্রাট আকবরের আমলেও কিছু কিছু আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর উভয়েই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও তিনি বহুশাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। আবার জাহাঙ্গীর ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি—অবসর সময়ে পুস্তক রচনা করতেন। এই দুই মহান সম্রাটের শিক্ষাবিস্তারে দান যথেষ্ট। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, ভারতীয় গণিত এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু এই সময় ভারতীয় মনীষার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও আকবরের প্রধানসচিব বীরবল, প্রধানমন্ত্রী ও আকবরের অকৃত্রিম বন্ধু আবুল ফজল, আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী, স্বয়ং জাহাঙ্গীর, বাবর কন্যা গুলবদন এবং পরবর্তীকালে শাহজাহান পুত্র দারাশিকো ও সম্রাটদুহিতা জাহানারা আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেবউন্নিসা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কিছুটা প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় এঁদের রচনা কেবলমাত্র সাহিত্যও ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন আয়ুর্বেদশাস্ত্র, জ্যোতি-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রকে নিয়ে আদৌ গবেষণা হয়নি বলা যেতে পারে।

সম্রাট আকবরের সময় মাত্র একজন আয়ুর্বেদ সংগ্রহকারের নাম পাওয়া যায়। তিনি পণ্ডিত ভাবমিশ্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে কান্যকুব্জ দেশের কোন

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতামাতার নাম জানা যায় না। তাঁর রচিত একখানি সংগ্রহপুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতে প্রচলিত আয়ুর্বেদশাস্ত্র তাঁর হাতে পুনরায় নবকলেবর প্রাপ্ত হয়।

ভাবমিশ্রের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে ভারতে বৈদেশিক বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তাদের দ্বারা বিস্তারলাভ করেছিল কিছু কিছু বিদেশী রোগ। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিদেশী রোগের বিবরণ ছিল না। পণ্ডিত ভাবমিশ্রই সেই সব বিদেশী রোগের কথা তুলে ধরেছিলেন সর্বসমক্ষে এবং প্রতিবিধানের উপায়েরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাবমিশ্র বিদেশ থেকে আগত রোগগুলিকে "ফিরিঙ্গী রোগ" নামে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকে কিছু কিছু "যাবনিক" দ্রব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু এমন ভেষজের উল্লেখ করেছেন যেগুলি ভারতের মাটিতে জন্মায় না।

পণ্ডিত ভাবমিশ্র সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। তিনি কোন মোগল সম্রাটের অনুগৃহীত ছিলেন বলে মনে হয় না।

ভাবমিশ্রের পর আর ভারতে আয়ুর্বেদের অনুশীলন হয় নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকটা দায়ী। প্রায় দুশ বছর ধরে এই অন্ধকার যুগের স্থায়িত্ব। এই সময়ের মধ্যে বহু প্রাচীন শাস্ত্রও লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের শেষ কর্ণধার ছিলেন ভাস্করাচার্য। আর পণ্ডিত ভাবমিশ্র প্রাচীন আয়ুর্বেদ জগতের শেষ মনীষী। তৈলবিহীন প্রদীপের মত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটা অতি ম্লান শিখায় কিছুকাল যাবৎ অল্প অল্প আলো বিতরণ করে আসছিল। হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল ভাবমিশ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। সুদীর্ঘ আড়াইশ—তিনশ বছরের পর আবার আয়ুর্বেদের অনুশীলন শুরু হয়েছে ভারতবর্ষে। এবার আর হঠাৎ নির্বাপিত হবে না।*

---

* চরক, সুশ্রুত, জীবক, চক্রপাণির বিস্তৃত পরিচয় "প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী" পুস্তকে প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের ভেষজ

এককালে মানুষ ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তার প্রয়োজনের সবকিছু তাকে সংগ্রহ করতে হত প্রকৃতির কাছ থেকে। এমন একদিন ছিল যেদিন বন থেকে শাক-পাতা ফল-মূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত. গাছের বাকল এবং পাতা থেকে প্রস্তুত করত পরিধেয় বস্ত্র. গাছের ডালপালা ও পাতা দিয়ে ঘর বাঁধত, আবার ডালপালায় আগুন ধরিয়ে বন্য জন্তুর আক্রমণ প্রতিরোধ করত। অসুখ-বিসুখ তখনও তাদের হত। কৃত্রিমভাবে ওষুধ প্রস্তুত করার বিদ্যা তখনও তারা অর্জন করিতে পারেনি। তাই অসুখ হলে শরণ নিতে হত ঐ গাছ পালার কাছে। রোগযন্ত্রণাকাতর আত্মীয়স্বজনদের মুখে সেদিন মানুষ গুঁজে দিত কেবল উদ্ভিদের পাতা কিংবা শেকড়। নদীমাতৃক উর্বর এই দেশে গাছপালার কোনদিন অভাব ছিল না। রোগ হলে গাছের পাতা ও গাছের মূল অন্ধভাবে তুলে দিত মানুষের মুখে। হয়ত বিপত্তিও ঘটত। এইভাবে মানুষ আবিষ্কার করল উদ্ভিদের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা ; পরিচয় পেল কতকগুলো ভেষজের। প্রাচীনকালে এই ভেষজের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। বৈদিক যুগে আর্যগণ প্রায় একশ-এর কাছাকাছি ভেষজের সন্ধান পেয়েছিল বলে মনে হয়। তারপর এদের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। চরক ও সুশ্রুতের আমলে এই সংখ্যা সাতশতে এসে দাঁড়ায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এগুলির সংখ্যা নগণ্য ছিল না। এতগুলি ভেষজ আবিষ্কারের কৃতিত্ব একমাত্র ভারতবাসীর। সে সময় পৃথিবীর আর কোন দেশে ভেষজ বিজ্ঞানকে নিয়ে এত ব্যাপক গবেষণা হয় নি।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট আলেকজান্দার এসেছিলেন ভারত আক্রমণে। সঙ্গে এনেছিলেন বহু গ্রীক পণ্ডিত। কথিত আছে, তাঁরা এদেশে প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, লৌহশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছলেন। যতদিন তাঁরা ভারতে ছিলেন ততদিন এদেশের শাস্ত্ররাশি পরম আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। আলেকজান্দারের ভারত ত্যাগের সময় সেই সব পণ্ডিতমণ্ডলী এবং কিছু কিছু ভারতীয় চিকিৎসক গ্রীস দেশে

যাত্রা করেন। সেই থেকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ভারতীয় ভেষজের খ্যাতি সারা গ্রীসদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর গ্রীস থেকে মিশর এবং মিশর থেকে রোম দেশ। জানা যায়, খ্রীষ্টজন্মের শত বছর পূর্বে ভারতীয় ভেষজ সুদূর গ্রীস ও রোমে রপ্তানী হত। সেদিন ভারত ভেষজ রপ্তানীতে বিদেশের কাছ থেকে লাভ করত প্রচুর স্বর্ণ। রোম একদিন দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল, "রোমের বেশীর ভাগ সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে কেবলমাত্র ভেষজ সংগ্রহ করতে।" গ্রীস ও রোম ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশগুলিতে ভারতীয় ভেষজের অত্যন্ত চাহিদা ছিল।

আরবের মুসলমান রাজাদের আমলে ভারতীয় ভেষজের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। আরবসম্রাটগণ ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এককালে বাগদাদের খলিফারা ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত। দেশীয় চিকিৎসকদের বদলে ভারত থেকে চিকিৎসক আনাতেন। ভারতীয় চিকিৎসকগণ সেখানে ভারতীয় প্রণালীতে চিকিৎসা করতেন এবং আমদানী করতেন ভারত থেকে ভেষজ। কোন কোন চিকিৎসক বিদেশী গাছ-গাছড়া নিয়েও পরীক্ষা চালাতেন। ফলে বিদেশেও সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল ভেষজ। সেগুলিও ধীরে ধীরে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। এই কারণে চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতায় যে সব ভেষজের বিবরণ আছে তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশজাত। শোনা যায়, চরকের সময় ভারত, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ থেকে ভেষজ সংগ্রহ করত।

ভারতে যেদিন বৌদ্ধধর্মের বন্যা এল সেদিন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মানুষের সেবায় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলেন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক যে সমস্ত সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁরা এই মহান ধর্মকে প্রচার করার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুকদের প্রেরণ করলেন দেশ বিদেশে। বিশেষ করে সম্রাট অশোকের সময় এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত হল বিরাট এক কর্মপন্থা। তিনি ভারতে, ভারতের বাহিরে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বড় বড় রাস্তার পাশে নির্মাণ করেছিলেন আরোগ্যশালা, রোপণ করেছিলেন চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রায়-ই চীন, জাপান, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। তাই ভারত থেকে যেমন কিছু কিছু ভেষজ

তাঁরা বহন করে নিয়ে যেতেন তেমনই সংগ্রহ করে আনতেন বহু বিদেশী ভেষজ। কিছু কিছু উদ্ভিদের চারাও নিয়ে আসতেন এবং রোপণ করতেন ভারতের উর্বর মৃত্তিকায়। এইভাবে আয়ুর্বেদের জন্য ব্যবহৃত ভেষজের সংখ্যা ভয়ানক ভাবে বেড়ে চলল। বিদেশী গাছ-গাছড়ার দেশী নাম প্রচলিত হল। এখন ভারতে যে সমস্ত উদ্ভিদ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বহিরাগত। কেবলমাত্র ভেষজের জন্য উদ্ভিদ আসেনি, বহু ফুল ও ফলের চারাও এসেছিল। এখন ভারতে উৎপন্ন গাছ-গাছড়ার কোন্‌টি যে দেশী আর কোন্‌টি বিদেশী তা নির্ণয় করা বড় শক্ত।

বর্তমানের মত সেদিনও ভারতীয় চিকিৎসকগণ উদ্ভিদের মূল, পাতা কিংবা বাকল থেকে নির্যাস তৈরী করতে সক্ষম হতেন। টক জাতীয় ফল থেকে অ্যাসিড বা অম্ল এবং কিছু কিছু উদ্ভিদকে পুড়িয়ে ক্ষারজাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করতেন। উপক্ষার জাতীয় পদার্থ সংগ্রহের রীতিও জানা ছিল। পদ্ধতিগুলি দীর্ঘকাল ভারতে প্রচলিত থাকলেও কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর দেশের লোকে স্বদেশীয় জিনিসের পরিবর্তে বিদেশী জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করল। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হল যে, দেশী জিনিস মাত্রই খারাপ, বিদেশী জিনিস ভাল এবং সস্তা। এখনও আমাদের সে মোহ যে একেবারে কেটে গেছে তা নয়। সেই থেকেই ভারতের নিজস্ব সম্পদগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল। ছ-শ বছরের অধিককাল মুসলমান রাজত্বে ভারতের যে ক্ষতি হয়নি মাত্র দু-শ বছর ইংরেজ রাজত্বে তার শতগুণ ক্ষতি হয়ে গেছে। যদিও লাভ কিছু কম হয়নি!

সুখের কথা, বর্তমানে বহু রসায়নবিজ্ঞানী উদ্ভিজ্জ পদার্থকে মানুষের প্রয়োজনে প্রয়োগ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের অনেকেই বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ রসায়নাগারে পরীক্ষা করে বহু প্রয়োজনীয় উপাদান নিষ্কাশন করছেন। আধুনিক ভারতীয় রসায়নের প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম এদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশী গাছ-গাছড়া থেকে ভেষজ নিষ্কাশন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে অনেক ওষুধ তিনি সরবরাহ করেছিলেন যেগুলির উপাদান ছিল দেশীয় গাছ-গাছড়া। সে সব ওষুধ এককালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। আচার্য

প্রফুল্ল চন্দ্রের দেখাদেখি কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান তাঁর পথকে অনুসরণ করেছিলেন। অত্যন্ত সুখের কথা, আজকের বহু রসায়ন বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু দেশীয় গাছগাছড়া।

তবুও ভারতের প্রাচীন ভেষজ শিল্পকে পুনরুদ্ধার করতে হলে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজন। এখনও বহু ভারতীয় বনৌষধিকে সুদূর সমুদ্রপার থেকে শোধন করে আনতে হচ্ছে ভারতে। তার জন্য ব্যয়ও হচ্ছে বহু অর্থ। অপর দিকে ভারতীয় জনগণও স্বল্পমূল্যে ওষুধ ক্রয় করতে পারছেন না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতের বনৌষধিকে বিদেশীরা একচেটিয়া করে নিয়েছে। যার পরোক্ষ ফল আমাদের আর্থিক দুর্গতি। বর্তমানে আমাদের দেশে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ভারতীয় ভেষজশিল্পকে পুনরুদ্ধার করে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ওষুধ প্রস্তুতির কারখানা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। জাতীয় সরকারও আগ্রহশীল। জনগণ আগ্রহশীল হয়ে উঠলেই ভারত তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

আয়ুর্বেদের অবলুপ্তির কারণ

বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধযুগ ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, ভারতে আগমনকারী বৈদেশিকদের বিবরণ, ভারতের বাহিরে ভারতীয় শাস্ত্রের অনুবাদ প্রচার ইত্যাদি থেকে ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃীষ্টজন্মের পূর্বে ভারতে আগত প্রত্যেকটি বিদেশী ব্যক্তি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রসংশা করে গেছেন। বৌদ্ধ-যুগে আয়ুর্বেদের প্রসার আরও বেড়ে যায়, বিশেষতঃ মহামতি অশোকের আমলে। কিন্তু অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। কেন্দ্রীয় শক্তি হীনবল হয়ে পড়ার ফলে ঘন ঘন বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হল দেশ। শান্তি-শৃঙ্খলা হল বিনষ্ট। তার প্রভাব পড়ল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। মৌর্যবংশের পতনের পর পুষ্যমিত্র শুঙ্গের আমলে শান্তি কিছুটা ফিরে এসেছিল বলে এই সময়টাতেও আয়ুর্বেদের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। কিন্তু সে শান্তিও বেশীদিন টিকল না। বিদেশী শক জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দেশ আরও হীনবল হয়ে পড়ল। কেবল কণিষ্কের আমলে এবং গুপ্তযুগে একটানা দীর্ঘদিন ধরে কিছুটা শান্তি বিরাজ করেছিল দেশে। এই দুই যুগে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। গুপ্তযুগের পর আয়ুর্বেদে আর কোন নতুন আবিষ্কার হয়নি বললেই চলে। এই যুগের পরই ভারতের রাজবংশগুলির দ্রুত উত্থান-পতন শুরু হয়। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন এল পরিবর্তন, অপরদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হানল দারুণ আঘাত। নতুন নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পুনরায় অরাজকতা, এইভাবে কেটে যেতে লাগল দিন। যখনই কোন শক্তিশালী রাজা কিংবা রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটল, তখনই শান্তি ফিরে আসায় অল্প-স্বল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হল কিন্তু গবেষণা একরকম বন্ধ হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়টা আয়ুর্বেদের সংগ্রহ ও সংস্কারের যুগ।

তারপরেই এল তুর্কি আক্রমণ। ভারতের জনগণের চিরাচরিত সংস্কার ও ঐতিহ্যের মূলে করল প্রচণ্ড আঘাত। আবার যেদিন ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল সেদিন মুসলমান শাসক সম্প্রদায় হিন্দুদের বিধর্মী বলে

দূরে সরিয়ে দিল। বিধর্মীর শিক্ষা, শিক্ষায়তন, ধর্মশাস্ত্র, মন্দির সবই ধ্বংস করল একে একে। শোনা যায়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে ইখতিয়ার-উদ্দিন বখতিয়ার খিলজি যে পরিমাণ তালপাতার পুঁথি পেয়েছিলেন তাতে কয়েক মাস ধরে তাঁর সৈন্যদের জ্বালানীর অভাব মিটেছিল। নালন্দায় রক্ষিত লক্ষ লক্ষ পুঁথির পাণ্ডুলিপি এই ভাবে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে গেল। কেবল-মাত্র নালন্দা নয়, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরীর মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনকেও বখতিয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সব শাস্ত্রের অনুশীলনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। অপরদিকে মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দুদের চিকিৎসা-পদ্ধতিকে ঘৃণা করতে লাগলেন কাফেরের চিকিৎসা বলে, স্বদেশ থেকে আনাতে লাগলেন হাকিমদের। হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত তাঁরা পূর্বেই হেনেছিলেন, এখন হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য পূর্বপুরুষদের সযত্ন রক্ষিত পুঁথিপত্রের কিছু কিছু অংশ নিয়ে পাড়ি জমাল বিদেশে। ঐ কারণে আজও দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের শতছিন্ন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে হয় তিব্বতে, নয়ত চীনে-জাপানে। কীটদষ্ট সেইসব মূল্যবান পুঁথি দেখে আজ ভারত কেবল আফশোষ করছে। সেদিন বহু শাস্ত্ররাশির সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেছিল।

রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে। আয়ুর্বেদ সংহিতা-গুলি রচিত হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে। সেগুলির প্রচার যথেষ্ট ছিল। পরবর্তী-কালে ভারতের মানুষ সংহিতাগুলির কথাকে বেদবাক্যের মত স্বীকার করে নিল, কিন্তু নতুনভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করল না। তাঁদের ধারণা যেহেতু চরক, সুশ্রুত, বিশ্বামিত্র, পরাশর এবং অগস্ত্য বলে গেছেন, অতএব এর উপর আর কোন কথা বলা যায় না। তাঁদের মধ্যেও যে ভ্রান্তি থাকতে পারে এমন চিন্তা কারও মধ্যে এল না। যাঁরা চরক সুশ্রুতের উপর টীকা রচনা করলেন, তাঁরা হয়ত নতুন কিছু তথ্য যোগ করলেন, কিন্তু চরক সুশ্রুতের বাণীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলেন। চরক সুশ্রুতের কথা, স্বয়ং ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বাণী, এই সংস্কার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধঃপতন দ্রুততর করে তুলল। পুরাতনকে জোর করে আঁকড়ে ধরার রীতি আর যে-কোন ক্ষেত্রে হোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলে না। পুরাতনকে ভিত্তি করে রচনা করতে হয় নব-নব সৌধ। আত্মতৃপ্ত ভারতবাসী সেদিকের ছায়াও মাড়াল না। যে সব বড় বড় মনীষীর আবির্ভাব হল তাঁরাও সংস্কারমুক্ত হতে পারলেন না, কেবল...

সংগ্রহই চালালেন। ভালকে আরও ভাল করা কিংবা খারাপকে বর্জন করার নীতি তাঁদেরও ছিল না। তাই সংগ্রহের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করল ভ্রম-প্রমাদ। খণ্ডিত কীটদষ্ট পুঁথিগুলির ব্যাখ্যা আবার বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে করলেন, সেই সব ব্যাখ্যায় যে পরিমাণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেল সে পরিমাণ আসল তথ্য পাওয়া গেল না।

পরবর্তীকালে প্রতিভার অভাবও একটা বড় কারণ। দ্বিতীয় পতঞ্জলি, দ্বিতীয় নাগার্জুন, দ্বিতীয় আর্যভট্ট কিংবা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য না হোক, তাঁদের বিরাট প্রতিভার ভগ্নাংশও কারও মধ্যে দেখা গেল না। তাছাড়া চরক সুশ্রুত ও পরবর্তী বৌদ্ধযুগে যেসব ভেষজ সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলির কোন কোনটি লুপ্ত হয়ে গেল, যেগুলি টিকে থাকল সেগুলির অঞ্চলভেদে নাম হয়ে পড়ল বিভিন্ন। আসল জিনিস হারিয়ে গিয়ে নকল জিনিসই স্থান অধিকার করে বসল। গাছ-গাছড়া নিয়ে পূর্বের মত রাসায়নিক বিশ্লেষণের ধারা যদি অব্যাহত থাকত তাহলে এমনটি হত না।

যে বৌদ্ধযুগ আয়ুর্বেদকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করাতে সাহায্য করেছিল সেই বৌদ্ধযুগও পরের দিকে আয়ুর্বেদের কম সর্বনাশ সাধন করল না। বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত চর্চা হ্রাস আর পালি ভাষার প্রসার আয়ুর্বেদের শরীরে প্রথম ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সব শাস্ত্রগুলিই ছিল সংস্কৃতে লেখা। পালির জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে সংস্কৃত-বিমুখতা এসে গেল।

মানুষের দৈন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিলুপ্তির আরও একটি কারণ। ঘন ঘন বৈদেশিক আক্রমণে রাজকোষ হয়ে পড়ল শূন্য, তার প্রত্যক্ষ ফল হল প্রজাদের দৈন্য। আগে চিকিৎসকদের প্রতিষ্ঠা ছিল সমাজে চিকিৎসকদের ব্যয়ভার জনগণ নিজেরাই বহন করত। কথিত আছে, চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা হলেই গৃহীরা সশ্রদ্ধভাবে অভিবাদন করত এবং নিজ সাধ্যমত কিছু না কিছু উপহার দিত। সে উপহার অর্থ-শস্য-ফল-মূল যাই হোক না কেন, অপরদিকে চিকিৎসকগণও রোগীর কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। প্রজারা নিঃস্ব হয়ে পড়ায় চিকিৎসকদের অর্থ উপার্জনের পথ দেখতে হল। প্রাচীনকালে আবার শিক্ষাদানের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক জড়িত ছিল না। অর্থের নেশা আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনল যত রকমের অনর্থ। পূর্বে ছাত্রদের উপনয়ন শেষে চলে যেতে

হত গুরুগৃহে। ' কঠোর নিয়মে গুরু শিষ্যদের বাছাই করে নিতেন। তীক্ষ্ণধী ও সম্বংশজাত ছাত্ররাই শিক্ষালাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হত। আয়ুর্বেদ শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে শবব্যবচ্ছেদ অবশ্যকর্তব্য ছিল। শল্য চিকিৎসার জন্য মৃত মানুষের চামড়া, মৃত পশু, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির উপর অস্ত্র প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হত। অক্ষরজ্ঞান এমনকি বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার পর একাদিক্রমে অন্ততঃ সাত বছর কাল আয়ুর্বেদ পড়তে হত এবং হাতে-নাতে শিক্ষালাভ করতে হত। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরু আবার ছাত্রকে পরীক্ষা করতেন। সে পরীক্ষা লিখিত কিংবা মৌখিক ছিল না। গুরুদেব বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে ছাত্রকে পরীক্ষা করতেন। যখনই যোগ্য বিবেচনা করতেন তখনই শিক্ষার্থীরা ফিরে আসত সমাজে। শিক্ষার্থীর আবার ঐখানে পরীক্ষার সমাপ্তি হত না, বৃত্তি গ্রহণ করার আগে তাকে দাঁড়াতে হত রাজার সামনে। রাজা এবং অভিজ্ঞ রাজচিকিৎসকগণ এবার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। সন্তুষ্ট হলে নিয়োগ করতেন প্রজাদের চিকিৎসার কাজে। অভিজ্ঞ রাজচিকিৎসকগণ গোপনে সন্ধান রাখতেন নবাগত চিকিৎসকটির উপর। কিছুকাল পরে রাজা সন্তুষ্ট যদি হতেন তাহলে তাকে পুরস্কৃত করতেন, ভূমি দান করতেন। সন্তুষ্ট না হলে চিকিৎসককে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হত।

সেদিন গুরুর কোন অর্থের দাবী ছিল না। কিছু উপযুক্ত শিষ্য তৈরি করাই ছিল গুরুদেবের শেষ বয়সের একটা ব্রত। তাঁর অধীত বিদ্যা এবং সারা-জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলীর হাতে তুলে না দিয়ে স্বস্তি পেতেন না। শিক্ষার্থীকে মনোমত করে গড়ে তুলতেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের জন্য সময় পেতেন যথেষ্ট। পরে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে অর্থোপার্জনের সম্পর্ক জড়িত হওয়ায় গুরুর সে যত্ন থাকল না এবং ছাত্ররাও দীর্ঘকাল ধরে গুরুগৃহে বাস করার কষ্ট স্বীকার করলেন না। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই ঘটল নিষ্ঠার অভাব। ছাত্ররা অল্প অভিজ্ঞতা লাভ করে চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলেন। আগে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীরের সমূহ যন্ত্রপাতির পরিচয় লাভ করতে হত, কয়েক বছর ধরে রোগ ও ওষুধের ফিরিস্তি মুখস্থ করতে হত, বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হত, এখন সেসব কিছুই থাকল না। গুরুদেব অর্থের বিনিময়ে অল্প বিদ্যা দান করে বিরাট উপাধি দিয়ে ছাত্রদের ছাড়তে লাগলেন, ছাত্ররাও কোন পরীক্ষার সম্মুখীন

না হয়ে গ্রামে গঞ্জে অর্থ উপার্জনের জন্য চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। যে সব চিকিৎসকের একটু পসার হল তাঁদের মধ্যে এল অর্থের লালসা এবং অহঙ্কারবোধ। অথচ পূর্বে চিকিৎসকদের মধ্যে কোন আত্মাভিমান ছিল না, ছিল কেবল সেবার মনোভাব।

বৌদ্ধযুগ আয়ুর্বেদের বুকে আরও একটা বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। সেই যুগে শল্য চিকিৎসা এবং শবব্যবচ্ছেদ প্রায় উঠে যেতে বসল। অশোকের পরবর্তীকালে দেশ থেকে চিকিৎসালয়গুলি উঠে গেল। যে কয়েকটি অবশিষ্ট থাকল সেখানে শবব্যবচ্ছেদ রীতি প্রচলিত ছিল না বলে মনে হয়, কারণ শবব্যবচ্ছেদ বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী ছিল। তারই প্রত্যক্ষ ফল শল্য চিকিৎসার অবলুপ্তি এবং এই বিদ্যেটা ক্ষৌরকারদের একচেটিয়া হয়ে পড়ল।

চিকিৎসকদের মনেও পরিবর্তন এসেছিল। চিকিৎসা যেকালে জনসেবা বলে পরিগণিত হত, সেকালে চিকিৎসকগণ রোগীকে ঘৃণা করতেন না। পরবর্তীকালে চিকিৎসকদের মনে জাত্যভিমান, গর্ববোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা আসার ফলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দিকে তাঁরা ফিরেও তাকালেন না। প্রসূতিবিদ্যার মত এতবড় বিদ্যা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যেতে লাগল। নীচজাতীয়া, সমাজপরিত্যক্তা, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা সেই স্থান অধিকার করে বসল। ফলে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে চলল আর হাজার হাজার মাকে অকালে নিতে হল চিরবিদায়।

এইভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রাচীন শাস্ত্র ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে যেতে আরম্ভ করল।

আয়ুর্বেদের পুনর্জাগরণ

এককালে আয়ুর্বেদ-ই ছিল পৃথিবীর একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি এবং তার প্রবর্তক প্রাচীন ভারতবর্ষ। কালক্রমে ভারতের বুকে নেমে এল অন্ধকার। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে আরোহণ করল পাশ্চাত্ত্য। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নেমে এল বিরাট আলোড়ন। বহু মানবদরদী মনীষী আর্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ কবলেন নিজেকে। একে একে আবিষ্কৃত হল বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকারের উপায়। রোগ নিরাময়ের জন্য আবিষ্কার হতে লাগল বহু কৃত্রিম রাসায়নিক ওষুধ কিন্তু ভেষজকে মানুষ বাদ দিতে পারল না। যেসব অ্যালোপ্যাথী ওষুধ বাজারে প্রচলিত সেগুলির অধিকাংশই হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেব দেহ থেকে সংগ্রহ করা। আজকাল যেসব জৈব অম্ল, উপক্ষার প্রভৃতি ওষুধ তৈরির মূল উপাদান সে সবই সংগ্রহ করা হচ্ছে উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদের উপক্ষার সংগ্রহ না করলে নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার হয়ত সম্ভব হত না। উপক্ষার হচ্ছে আঠা বা রস জাতীয় পদার্থ যা উদ্ভিদ মূলে, পাতায় কিংবা বাকলে সঞ্চয় করে বাখে। এগুলিকে উদ্ভিদের বর্জ্য পদার্থও বলা যেতে পারে। আমরা বাঁচার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকি কিন্তু খাদ্যের সবটা শরীর গঠনের কাজে ব্যয়িত হয় না। সার অংশ শরীরের পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত হয়, অসার পদার্থগুলো মল-মূত্র-ঘাম প্রভৃতির আকারে শরীর পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদের দেহের গঠন মানুষের মত নয় কিন্তু তাদের খাদ্যেও সার অসার দু-ধরনের জিনিস থাকে। অসারগুলো সদ্য সদ্য পরিত্যাগ করতে না পারায় সেগুলি ছাল পাতা বা মূলে সঞ্চয় করে রাখে। যখন তাদের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন গাছের পাতা বা ছাল আপনা হতে ঝরে পড়ে। এই বর্জ্য পদার্থগুলিই উপক্ষার। সব উদ্ভিদের উপক্ষার এক ধরনের নয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন উপক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের। কোন কোন উপক্ষার বিষাক্তও হয়ে থাকে। তাই ওরা উদ্ভিদকে জীবজন্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। কিন্তু মানুষ আবিষ্কার করেছে ওদের মধ্যে অসাধারণ রোগ-নিরাময় ক্ষমতা। সিঙ্কোনা গাছের ছালের উপক্ষার থেকে কুইনিন-সিঙ্কোনিন,

কুচিলার ফলের উপক্ষার থেকে স্টিক্‌নিন্‌, চা-পাতার উপক্ষার থেকে কেফিন, আফিং গাছের উপক্ষার আঠা থেকে মরফিন, বাসক পাতার উপক্ষার থেকে ভ্যাসিনিন্‌ সর্পগন্ধার শেকড়ের উপক্ষার থেকে আজমালিন্‌, সার্পেন্‌টিন্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত করে মানুষ বিভিন্ন রোগে অব্যর্থ ফলপ্রসূ ওষুধরূপে ব্যবহার করছে।

উদ্ভিদ ছাড়া মানুষের রোগ নিরাময়ের কোন উপায় নেই। এমনকি আধুনিক যুগের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার পেনিসিলিন নোটেটাম একজাতীয় বিরল ছত্রাক। যক্ষ্মা রোগেরও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে এই ধরনের এক বিবল ছত্রাক থেকে। মানুষ বুঝতে পেরেছে ঐ উদ্ভিদের মধ্যে আছে মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের উপায়। তাই এখন উদ্ভিদ আর আয়ুর্বেদকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেশে দেশে।

ভারতও তার প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে যত্নবান। আয়ুর্বেদের উন্নতি-কল্পে এগিয়ে এসেছেন বহু স্বনামধন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী। বহু পুস্তক-পুস্তিকা বচিত হচ্ছে, সবকারী উদ্যোগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে আয়ুর্বেদ কলেজ। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে মেডিক্যাল কলেজেব পাশাপাশি আজ অবস্থান করছে আয়ুর্বেদ কলেজ।

আরও আনন্দের কথা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন আজকের ভারতের প্রথমশ্রেণীর রসায়ন-বিজ্ঞানিগণ। ইতিমধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন বহু উদ্ভিদের ভেষজগুণ এবং কয়েকটি ফলপ্রদ ওষুধও। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গণিত ও রসশাস্ত্র

গণিতের কথা

গণিত অতি প্রাচীনশাস্ত্র। সুদূর অতীতে যেদিন মানুষ বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল তার আগেও ছিল তার মনে গণিতের চিন্তা। ব্যবহারিক জীবনে গণনা ছাড়া কোন কাজ চলে না। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তাদের একমাত্র সম্পদ ছিল পাথর ও পশু। পাথর ছুড়ে শিকার করত এবং আত্মরক্ষা করত; পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। পাথর ও পশুর গণনা তাই অপরিহার্য হয়ে উঠে। প্রথম দিকে অর্থাৎ প্রস্তরযুগে তারা পশুপালনও করত না। সেদিনের সম্পদ ছিল পাথর। পাথর ঘষে মেজে একটু ধারাল করে পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখত। তাই হয়ত পাথরের সংখ্যা গণনার জন্য ছিল তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। অনুমান করা হয়, প্রথমে তারা সংখ্যা ঠিক করত হাতের কিংবা পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে। সংখ্যা যদি অধিক হত তাহলে সমান সংখ্যক গাছের পাতা বা পাথরের নুড়িকে রেখে দিত। পরের দিকে পশুর সংখ্যাও নির্ণয় করত ঠিক এইভাবে। কিন্তু চিরকাল তো এমনভাবে চলতে পারে না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বেড়ে চলল। চিন্তাশক্তির হল প্রসার, দু-দশ-বিশ-পঞ্চাশটা পাথরের নুড়ি কিংবা গাছের পাতার দ্বারা কাজ চলল না। তখন সংখ্যা গণনার জন্য পাহাড়ের গুহার গায়ে রাঙা মাটি দিয়ে দাগ কাটতে আরম্ভ করল। ঐ দাগ থেকেই মনে হয় প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল সংখ্যার প্রতীকচিহ্ন। সেদিনের মানুষ বিশেষ বিশেষ দাগকে বিশেষ সংখ্যারূপে চিহ্নিত করল।

সেদিন সব দেশ একটা-না-একটা প্রতীক ঠিক করে নিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মানুষের প্রয়োজন উত্তরোত্তর যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত প্রতীকের সংখ্যা বেড়ে চলল। শত শত এমনকি হাজার হাজার সংখ্যার প্রতীক আবিষ্কার করা যেমন কষ্টকর তেমনই কষ্টকর মনে রাখা। সংখ্যা গণনার একটা সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করেছিলেন প্রাচীনকালের সব দেশের মনীষীবৃন্দ। কিন্তু কোন দেশ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সংখ্যার প্রতীক নির্ণয় করতে পারেন নি। কৃতকার্য হয়েছিলেন একমাত্র ভারতীয়রা। পৃথিবীর সবকটি দেশ যখন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভারত আবিষ্কার করল "0" (শূন্য) এর মাহাত্ম্য। তাঁরা দেখালেন ১ থেকে ৯ এই কয়েকটি প্রতীক ঠিক

করে তাদের সঙ্গে "0"কে ব্যবহার করতে পারলেই যত খুশী সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। শূন্যকে ব্যবহার করে প্রাচীনকালে ভারত শত, সহস্র, লক্ষ, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা যখন নির্ণয় করলেন তখন সারা বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ভারতের দিকে। আমরা জানি, প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে বিজ্ঞান ও গণিতের চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। বিজ্ঞানে তাঁদের আবিষ্কার আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে এবং একবাক্যে বিশ্ববাসী গ্রীসের ঋণ স্বীকার করে থাকেন। এমন যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত গ্রীস দেশ সেখানেও গণিতে তৎকালে (১০,০০০) দশহাজারের ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়নি। ঠিক সেই সময় ভারতীয় গণিতে দশহাজারের দশ, একশ, এমনকি হাজারগুণ বৃহত্তম সংখ্যার পরিচয় আছে। ভারতের "শূন্য"কে কাজে লাগানোর পদ্ধতি সেদিন বাধ্য হয়েই বিশ্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। প্রথমে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি দেশই প্রতীক ঠিক করেছিল। এক থেকে নয় পর্যন্ত প্রতীকগুলি রেখে তারাও ভারতের মত শূন্য (0) ব্যবহার করতে লাগল। তাই এক থেকে নয় পর্যন্ত প্রতীকগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও "0" প্রতীকচিহ্নটি সব দেশের একই। "0" আবিষ্কার ভারতেরই কৃতিত্ব। সংখ্যা গণনা যদি গণিতের ভিত্তি হয় তাহলে সে ভিত্তি স্থাপন করেছে ভারতবর্ষ। আজ বিজ্ঞানে ভারতের দান যত অকিঞ্চিৎকর বলে বিদেশীরা মনে করুক না কেন, বিজ্ঞান যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই গণিতেরই সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষ।

সংখ্যা গণনার পদ্ধতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত গণিতে সব দেশকে ছাড়িয়ে গেল। একে একে আবিষ্কৃত হল পাটীগণিত ও বীজগণিতের বিভিন্ন তথ্য যা আজও প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবশ্য শিক্ষণীয়রূপে সবদেশে প্রচলিত।

গণিতে ভারতের প্রাচীন আবিষ্কারসমূহ আলোচনা করতে হলে ভারতীয় গণিতের কালকে দুটি যুগে ভাগ করতে হয়ঃ ১) বৈদিক যুগ, (২) বেদোত্তর যুগ। বৈদিক যুগের ব্যাপ্তিকাল আধুনিক বিচারে খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে খৃষ্টজন্মের পাঁচশ বছর পূর্ব পর্যন্ত মোট প্রায় দু-হাজার বছর কাল। এই সময় কোন গণিত গ্রন্থ রচিত হয় নি ; কেবল গণিতের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। বেদ অপেক্ষা বেদাঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রগুলিতে গণিতের সুসংবদ্ধ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। বেদ রচিত হওয়ার পরই ভারতীয় মনীষা গণিতে নিয়োজিত হয়।

গণিতের একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যও অনেকে প্রয়াস পান। তাই দেখা যায়, গণিতের এক-একটি শাখা এক-একটি শাস্ত্রের কিছুটা স্থান অধিকার করে আছে। যেমন বলা যেতে পারে, বৈদিক শুল্বসূত্রগুলিতে জ্যামিতির পরিচয় এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পাটীগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা আছে। সেকালে বিজ্ঞানের ভাগ ছিল না, তাছাড়া জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে গণিত বর্তমানের মত পূর্বেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।

বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত শুল্বসূত্র এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ থেকে গণিতের চারটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই শাখাগুলি যথাক্রমে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা। পাটীগণিত একরকম বৈদিক যুগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। সংখ্যা গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এমনকি বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতিও জানা ছিল বৈদিক যুগে। সে যুগে একদিকে যেমন বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় অপরদিকে খুব ছোট ছোট সংখ্যাও দেখতে পাওয়া যায়। এক-তৃতীয়াংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে জানা যায় ভগ্নাংশেরও প্রচলন হয়েছিল বৈদিক যুগে। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সূক্ষ্মতার পরিচয় রেখে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ। ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং বর্গমূলেরও প্রচলন ছিল। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্গমূল এবং বর্গক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে খুব বেশী। মোটকথা, সংখ্যা গণনা, এক অপেক্ষা ছোট কিংবা বড় সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল প্রভৃতি আধুনিক পাটীগণিতের মুখ্য বিষয়গুলি ভারত বৈদিক যুগেই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।

বীজগণিতের আবিষ্কারগুলি আরও বিস্ময়কর। আমরা বীজগণিতের যে অংকগুলিকে সমান্তর শ্রেণী বা এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশান এবং গুণোত্তর শ্রেণী বা জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশান এর যোগফল নির্ণয় বলে থাকি সেটি ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের আবিষ্কার। সমবায় বা কমবিনেশন এবং বিন্যাস বা পারমিউটেশনের মত দুরূহ বীজগণিতের অংকও প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র উদাহরণ নয়, গাণিতিক সূত্রেও আলোচিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। বীজগণিতের অপরাপর অংকের মধ্যে সমীকরণ সমাধান এবং জ্যামিতিক প্রশ্নে বীজগাণিতিক সমাধান আলোচিত হয়েছে। একমাত্রা ও দুইমাত্রার অনির্ণেয় (ইনডিটার সিলেক্ট) সমীকরণের সমাধান একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়।

পাটীগণিত ও বীজগণিতে বৈদিক ভারতবর্ষের যে পরিমাণ অসামান্য দান আছে সে পরিমাণ জ্যামিতিতে নেই। পূর্বে বৈদিক শুল্বসূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এবিষয়ে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির পরিচয় একমাত্র শুল্বসূত্রগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়। শুল্ব গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যজ্ঞবেদী নির্মাণ। কাত্যায়ন, বৌধায়ন, আপস্তম্ব রচিত কয়েকটি শুল্বসূত্রেই জ্যামিতির পরিচয় আছে। অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে জ্যামিতির আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। আবার এই শুল্বসূত্রগুলিতে সুসংবদ্ধ জ্যামিতিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে, রচয়িতাদের জ্যামিতির জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। পৈতৃকী বেদী আলোচনা প্রসঙ্গে বৌধায়ন যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটি পিথাগোরাসের প্রসিদ্ধ উপপাদ্যটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যদিও এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়, তথাপি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ঋতু নির্ণয়, মাস-তিথি-রাশি ও নক্ষত্রগণনা, বৎসরের দিনসংখ্যা নিরূপণ, চান্দ্র ও সৌর বছরের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বৈদিক ভারত গভীর গণিত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

পিথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস, আর্কিমিদিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্‌গণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে রচিত হয়েছিল বৈদিকসাহিত্য। বৈদিকসাহিত্যে আলোচিত পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির বহু দুরূহ তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে বৈদেশিক গ্রন্থগুলিতে। বিদেশী পণ্ডিতগণ হয়ত একথা স্বীকার করতে চাইবেন না, ভাববেন মনে মনে এ কেবল অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছু নয়। গণিতের অপরাপর শাখার দান তাঁরা যদি স্বীকার না করেন তাহলেও অন্ততঃ যেন স্মরণ করেন যে পাটীগণিতের "০" (শূন্য) ও দশমিক পদ্ধতির কথা কোন প্রাচীন দেশের গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। এই দুই কীর্তিই যে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গাণিতিক আবিষ্কারগুলির অন্যতম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের প্রতি কেউ কেউ নাসিকা কুঞ্চন করলেও বহু বিদেশী পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন। অন্য কোন আবিষ্কার না করে বৈদিক যুগ যদি ঐ একটিমাত্র আবিষ্কার করত, তাহলেও বিশ্ববাসীকে গণিতশাস্ত্রে ভারতের দান চিরকাল স্মরণ করতে হবে।

বৈদিক যুগের পর অঙ্কশাস্ত্রে ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই যুগকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ বলা হয়। এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমিতপ্রতিভাধর কয়েকজন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌।

এঁদের প্রতিভার স্পর্শে ভারতের গণিত এত উচ্চশিখরে আরোহণ করে যে সারা পৃথিবী সেদিন বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল ভারতের দিকে। এই সুমহান-শাস্ত্রকে আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করার জন্য সারা পাশ্চাত্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বেদোত্তর যুগে পাটীগণিতের বিশেষ প্রসার হয়নি। বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত পাটীগণিতের তথ্যাবলী সুশৃংখল পদ্ধতিতে আলোচিত হয়েছে এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে দুএকটি নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে মাত্র। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল, ত্রৈরাশিক ল.সা.গু., গ.সা.গু.র নিয়মগুলি বেদোত্তর যুগের দান। কিন্তু এগুলি আলোচনার জন্য সেযুগে কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়নি। বেদোত্তর যুগেই এইগুলি গণিতশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ধারাবাহিক ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে আলোচিত হয়। বেদোত্তর যুগে পাটীগণিতের আবিষ্কারগুলির মধ্যে আছে সুদসংক্রান্ত বিষয়, বিনিময়, মিশ্রণ এবং অংশীদারী। এক কথায়, বর্তমানে প্রচলিত পাটীগণিতের সঙ্গে সেযুগের পাটীগণিতের মধ্যে তফাত বড় একটা ছিল না।

বেদোত্তর যুগের সবচেয়ে বড় অবদান বীজগণিতকে ভিত্তি করে। বৈদিক যুগে বীজগণিতের যে শিশু-চারাটি রোপিত হয়েছিল বেদোত্তর যুগে আর্যভট্ট, মহাবীরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য এবং ভাস্করাচার্যের হাতে সেটি এক মহা-মহীরূহে পরিণত হয়। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, গণিতের যে সব শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই সব আবিষ্কারের অনেক-গুলির আবিষ্কর্তা বেদোত্তর যুগের ভারতবর্ষ। পরবর্তীকালে গণিতের চর্চা অব্যাহত না থাকার জন্য বিশ্বের দরবারে ভারত যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, তথাপি বীজগণিতের দু-একটি আবিষ্কার ভারতীয় দান হিসাবে আজও বিশ্ববাসী স্বীকার করে।

আর একটি বড় দান দুইমাত্রা বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় কোয়াড্রাটিক ইকোয়াশান। পদ্ধতিটি শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতি নামে খ্যাত। শ্রীধরাচার্যের পর ভাস্করাচার্য বীজগণিতকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক ও বহুমাত্রার সমীকরণ সমাধান, সহ সমীকরণ ও অনির্ণেয় সমীকরণের যে সব সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের আলোচনা শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্যের গ্রন্থে দেখা যায় এমনটি বিশ্বের অপর কোন প্রাচীন জাতির গ্রন্থে পাওয়া যায়

না। বেদোত্তর যুগের গণিত বর্তমানে একটা পরম বিস্ময়। ভাবলে অবাক হতে হয়, যে যুগে বিজ্ঞানের কোন শাখাই পুষ্ট হতে পারেনি, সেই অন্ধকার যুগে ভারতীয় মনীষীরা কেমন করে আবিষ্কার করেছিলেন এমন সূক্ষ্ম তথ্য? বিশ্বের বিজ্ঞানসমাজও বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্যই স্ব স্ব কালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

গণিতের অন্যান্য শাখায়ও বেদোত্তর যুগের ভারতবর্ষের দান কম নয়। জ্যামিতি ও পরিমিতি আলোচনা করতে গিয়ে গ্রীসদেশের মত সুসংবদ্ধ প্রণালী তাঁরা অনুসরণ করেননি, তবুও ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ের কয়েকটি সূত্র, বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য প্রভৃতি বিশ্বের জ্যামিতি শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে। বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটির আবিষ্কর্তা ব্রহ্মগুপ্ত। অঙ্কের ক্ষেত্রে ভারতের একটা বড় অবদান π (পাই)-এর মান নির্ণয়। আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত উভয়ে π (পাই) এর মান নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন। বেদোত্তর যুগে জ্যামিতি অপেক্ষা ত্রিকোণমিতির দিকে আগ্রহ ছিল বেশী। ত্রিকোণমিতিকে অবশ্য উচ্চাঙ্গের জ্যামিতির পর্যায়ে ফেলা যায় এবং এই শাস্ত্রটি পাশ্চাত্ত্য আবিষ্কার করেছে অনেক পরে। আর্যভট্ট, শ্রীধরাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে ত্রিকোণমিতির মূল সূত্রগুলির উল্লেখ আছে। তাঁদের গ্রন্থে বর্ণিত 'জ্যা' ও 'কোটি জ্যা'-র আধুনিক নাম সাইন ও কোসাইন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানিগণ স্বীকার করুন অথবা নাই করুন ত্রিকোণমিতির প্রথম উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ। ভাস্করাচার্যই ত্রিকোণমিতির ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার পরিচয়ও স্পষ্ট। চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে গিয়ে ভাস্করাচার্য কলনবিদ্যার অবতারণা করেছেন। এই কলনবিদ্যার আভাস প্রথম দান করেন মুঞ্জাল নামে ভাস্করাচার্যের পূর্ববর্তী জনৈক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। সমাকলন ও অন্তরকলন অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েল ক্যালকুলাস ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস দুই ধরনের ক্যালকুলাসের পরিচয় মুঞ্জাল ও ভাস্করাচার্য উভয় গণিতজ্ঞের রচনায় পাওয়া যায়। অথচ এই ক্যালকুলাস আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে নিউটনের আমলে। বেদোত্তর যুগের তাই সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ত্রিকোণমিতি ও কলনবিদ্যা এবং এ বিদ্যার প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে ভারত চিরকাল গর্ববোধ করতে পারে।

গণিতগ্রন্থ পরিচয়

জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বেদোত্তর যুগের জ্যোতির্বিদ্‌দের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করে উন্নতিলাভ করেছিল বলে যে সব বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করে জ্যোতিষশাস্ত্রকে উন্নত করেছেন, তাঁরাই আবার সমৃদ্ধ করেছেন গণিতকে। তাই এখানে তাঁদের জীবনী আলোচিত হল না, কেবলমাত্র কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গণিত গ্রন্থের সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

আর্যভট্টীয়

আর্যভট্টীয় গ্রন্থটির রচয়িতা মহর্ষি আর্যভট্ট বা আর্যভট। পরবর্তীকালে আরও একজন আর্যভট্টের আবির্ভাব হয়েছিল বলে অনেকে আর্যভট্টীয় প্রণেতা আর্যভট্টকে প্রথম আর্যভট্ট নামে অভিহিত করেন। আর্যভট্টীয় চার অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম (১) গীতিকাপাদ, (২) গণিতপাদ, (৩) কালক্রিয়া, (৪) গোলপাদ। পুস্তকটিতে মোট ১২১টি শ্লোক আছে। গীতিকাপাদের শ্লোকসংখ্যা ১৩টি, গণিতপাদের ৩৩টি, কালক্রিয়ায় ২৫টি এবং গোলপাদের ৫০টি। একমাত্র গণিতপাদের ৩৩টি শ্লোকে বিশুদ্ধ গণিতের আলোচনা আছে। বাকী তিনটি অধ্যায়ের ৮৮টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে জ্যোতি-র্বিদ্যা। গণিতপাদের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ পাটীগণিত, তবে অন্যান্য শাখারও কিছু কিছু আলোচনা আছে।

পাটীগণিতের যে অংশটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই অংশটি হল সংখ্যা গণনা। আর্যভট্ট সংখ্যা প্রকাশের এক অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। ১ থেকে ২৫ সংখ্যাগুলিকে তিনি 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি অক্ষর দিয়ে সূচিত করেন। য, র, ল, ব, শ, ষ, স এবং হ এই আটটি অক্ষরের দ্বারা ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ সংখ্যাগুলি নির্দেশ করেন। 'অ' প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলে 'অ'-এর মান সব সময় ১ ধরা হয়েছে। 'ই'-র মান

১০০, 'উ'-র মান ১,০০,০০, 'ঋ'-র মান ১০,০০০,০০, '৯'-র মান ১,০০০,০০০,০০ এই ভাবে এ, ঐ, ও এবং ঔ-র মান ১০০ গুণ করে বেড়ে চলে। আর্যভট্ট লক্ষের পর নিযুত, তারপর প্রযুত, তারপর অব্জ ধরেছেন। তাঁর হিসাবে এক অব্জ=১০০ কোটি। আর্যভট্টের পূর্বে কোন দেশের অঙ্কশাস্ত্রে এত বড় সংখ্যার উল্লেখ নেই।

গণিতপাদে আর্যভট্ট বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে আমরা আজকাল 'π' অক্ষর দিয়ে সূচিত করে থাকি। এটি একটি নিত্য-সংখ্যা এবং π-র মান ধরা হয় $\frac{২২}{৭}$। আর্যভট্ট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে π-র পরিবর্তে সর্বক্ষেত্রে ৩·১৪১৬ ধরেছেন। এই মান বর্তমান নির্ণীত মান-এর সঙ্গে প্রায় সমান। দশমিকের পর দু-অঙ্ক পর্যন্ত মিলে যায়। গুণোত্তর শ্রেণীর ও সমান্তর শ্রেণীর যোগফল আর্যভট্ট শুদ্ধভাবে নির্ণয় করেছিলেন।

ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত। পুস্তকখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও এককালে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় একখানি সেরা গ্রন্থ। গণিত বিষয়ক আলোচনার অংশটিতে বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যামিতির আলোচনা আছে। পাটীগণিতে বিশেষ মৌলিকতার সন্ধান না পাওয়া গেলেও বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ব্রহ্মগুপ্তের দান অসামান্য। এই যুগে জ্যামিতির আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়লেও ব্রহ্মগুপ্ত আবিষ্কৃত বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপপাদ্যটি ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য নামে আজও প্রচলিত। ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির আলোচনা আছে। বীজগণিতের ক্ষেত্রে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর পূর্বের আবিষ্কৃত তথ্যগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত অমর হয়ে আছেন অপর কারণে। একমাত্র ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তই বহির্বিশ্বে ভারতের খ্যাতিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা আজকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যে বীজগণিত ব্যবহার করে থাকি তার মূল বিষয়গুলি ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত। অনুবাদের মাধ্যমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে

পৌঁছেছিল বলে ইউরোপীয় ও আরবীয় পণ্ডিতদের হাতে পড়ে ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত নতুন কলেবর প্রাপ্ত হয়েছিল। কালক্রমে ঐ গ্রন্থই বিদেশীদের মারফতে নতুন-রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে আমাদের হাতে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি

সিদ্ধান্ত শিরোমণির রচয়িতা ভারতপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য। গ্রন্থটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির নাম (১) লীলাবতী, (২) বীজগণিত, (৩) গ্রন্থ গণিতাধ্যায়, (৪ গোলাধ্যায়। সব অধ্যায়ে গণিতের কিছু কিছু তথ্য আলোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের অংশগুলিতে উন্নত গণিতের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদোত্তর যুগে আবিষ্কৃত গণিতের বিস্তৃততর আলোচনা একমাত্র সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। লীলাবতী অংশটিতে পরিমিতি, পাটীগণিত, কিছু জ্যামিতি এবং বীজগণিতের দ্বিঘাত সমীকরণের আলোচনা স্থান পেয়েছে। লীলাবতী সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কেউ মনে করেন, অংশটি ভাস্করাচার্যের বিদুষী কন্যা লীলাবতী রচনা করেছিলেন। কেউবা মনে করেন, এটিও ভাস্করের নিজস্ব রচনা। সিদ্ধান্ত শিরোমণির এই অংশটুকুই সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। শোনা যায়, আকবরের সময়ও এটির অনুবাদ অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগণিতে আলোচিত হয়েছে উন্নত বীজগণিতের প্রণালীগুলি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ লীলাবতী ও বীজগণিতের অধ্যায়গুলিতে ভাস্করাচার্যের মৌলিকত্ব বিশেষ প্রকাশ পায় না। সিদ্ধান্ত শিরোমণির মৌলিক অংশ গোলাধ্যায়। বর্তুলের ঘনফল নির্ণয় করতে গিয়ে এবং চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি উন্নত গণিতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তুলের ঘনফল নির্ণয়ে তিনি বর্তুলকে বহু সংখ্যক শিখরে বিভক্ত করেছেন। শিখরগুলির প্রত্যেকটির শীর্ষবিন্দু বর্তুলের কেন্দ্ররূপে ধরা হয়েছে। বর্তুলের ঘনমান নির্দেশ করা হয়েছে শিখর গুলির ঘনমানের সমষ্টি। এই পদ্ধতিই সমাকলন বা ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের প্রক্রিয়া। বর্তুলের তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ব্যাপারেও যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে তার সঙ্গেও সমাকলন প্রক্রিয়ার তুলনা করা চলে।

কেবলমাত্র সমাকলন নয়, অন্তরকলন বা ডিফারেন্সিয়্যাল ক্যালকুলাসেরও ব্যবহার করেছেন ভাস্করাচার্য। সৌভাগ্যক্রমে সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থটি অপরাপর মূল্যবান গ্রন্থের মত হারিয়ে যায়নি। আজও স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে কোন সমালোচক কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে সাহসী হন না।

ত্রিশতিকা

ত্রিশতিকার রচয়িতা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ আচার্য শ্রীধর। তিনশ শ্লোক সম্বলিত এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবলমাত্র আলোচিত হয়েছে বীজগণিত ও পাটীগণিত। অন্যান্য গ্রন্থের মত এই গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা নেই, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ গণিত। বীজগণিতে শ্রীধরাচার্যের সবচেয়ে বড় অবদান দ্বিঘাত সমীকরণের তত্ত্ব। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে শ্রীধরের বহু নিয়ম উদ্ধৃত করেছেন এবং ত্রিশতিকার বীজগণিতের অংশটুকুর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বর্তমানে যে ত্রিশতিকা গ্রন্থখানি পাওয়া যায় তাতে ভাস্করাচার্য-উল্লেখিত বীজগণিত তত্ত্বের অধিকাংশই পাওয়া যায় না। সেইজন্য মনে করা হয় আসল ত্রিশতিকা গ্রন্থখানি অনেক পূর্বে লুপ্ত হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে, ভাস্করাচার্যের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ত্রিশতিকার বিলুপ্তির কারণ।

ভাস্করাচার্য স্বীয় গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য ও মুঞ্জালকে অনুসরণ করেছেন বলে লিখে গেছেন। কিন্তু এই দুই মহান গণিতজ্ঞের জীবনী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি। ত্রিশতিকা গ্রন্থে শ্রীধর নিজের সম্বন্ধে যতটুকু বলেছেন তা থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের লোক। জন্মস্থান গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত রাঢ় দেশের একটি গ্রাম। পিতার নাম বলদেব শর্মা, মাতা অচ্ছোকা দেবী। ৯১৩ শকাব্দে (বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীধরাচার্য ত্রিশতিকা গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন।

বাংলাদেশে আরও একজন শ্রীধরের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ ন্যায়কন্দলী গ্রন্থের রচয়িতা। অনেকেই মনে করেন, দার্শনিক শ্রীধর এবং গণিতজ্ঞ শ্রীধর অভিন্ন ব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীধর পরলোক গমন করেন।

গণিতসারসংগ্রহ

আর্যভট্টীয়, সিদ্ধান্ত শিরোমণি এবং ত্রিশতিকার পরে যে মহামূল্য গণিত গ্রন্থটির নাম করতে হয়, সেটি গণিতসারসংগ্রহ। পূর্ববর্ণিত গ্রন্থগুলির মত এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন না করলেও প্রাথমিক গণিত হিসাবে পুস্তকখানির মর্যাদা কোনদিন ক্ষুন্ন হবে না। এই গ্রন্থে পাটীগণিত ও জ্যামিতির মূল তথ্যগুলি অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। পুস্তকটিতে বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে এবং নিত্য সংখ্যাটি নির্ধারণের বেশ কয়েকটি উপায় বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এবং ত্রিকোণমিতির ব্যবহারও উক্ত গ্রন্থটিতে আছে।

গণিতসারসংগ্রহ রচয়িতা মহাবীরাচার্য বেদোত্তর যুগের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি অমর হয়ে থাকবেন গণিতসারসংগ্রহ পুস্তকটির জন্য। পুস্তকটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য নয়।

লঘুমানস

লঘুমানসের রচয়িতা প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত মুঞ্জাল। আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য ও ব্রহ্মগুপ্তের মত ইনিও গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। লঘুমানসের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সমাকলন ও অন্তরকলনের ব্যবহার। ভাস্করাচার্যের পূর্বে এই একটিমাত্র গ্রন্থে কলনবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

রসায়নের কথা

প্রাচীন ভারতে একজাতীয় ওষুধকে 'রসায়ন' নামে অভিহিত করা হত। এই ওষুধগুলি কোনো কোনো ধাতুজাত এবং সেবনে আয়ুবৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সুশ্রুত সংহিতা, চরক সংহিতা, এবং পরবর্তীকালে নাগার্জুনের গ্রন্থে এই জাতীয় ওষুধের উল্লেখ আছে।

সুপ্রাচীন কালে 'রস' বলতে মুনিঋষিগণ বুঝিয়েছেন, গাছপালার শেকড়, লতাপাতা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তরল পদার্থ বা নির্যাস। অনেক সময় গাছের পাতা বা শেকড়কে ভালভাবে পিষে ফেলা হত। পেষণের ফলে যে রস নির্গত হত তাকে জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরি করা হত অনেকটা উপক্ষার সংগ্রহের মত। এই পদ্ধতি আগেকার দিনে ভেষজ প্রস্তুতির ছিল মূলনীতি। এই নীতিটি রসশাস্ত্র নামে বর্ণিত। পরবর্তীকালে ভেষজ প্রস্তুতির জন্য পাতন প্রণালীর উদ্ভাবন হয়। স্বতঃপাতন, ঊর্ধ্বপাতন এই দুই রকমের পাতনের পরিচয় নাগার্জুনের সময় প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগে রচিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে লৌহাদি ধাতুকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের রীতি ছিল না। সুশ্রুত সংহিতায়ই প্রথম লোহাকে ওষুধ রূপে ব্যবহার করতে দেখা যায়। লৌহ-নিষ্কাশন পদ্ধতি ভারতবর্ষে সুশ্রুতের অনেক পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরবর্তী চরক সংহিতার যুগে পারদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পারদের অন্যান্য ব্যবহার তখন বিশেষ জানা ছিল না, কিন্তু পারদভস্ম রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতে পারা যায়, এই তথ্যটুকু প্রদান করা হয়েছে। পারদ আবিষ্কারের পরে ভারতে একদল তান্ত্রিক সাধুর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা পারদকে বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহ বা মূল থেকে নিষ্কাশিত তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে সোনা তৈরি করতে চেষ্টা করতেন। সোনা তৈরি করতে তাঁরা সক্ষম হননি ঠিকই, তবে কতকগুলো ওষুধ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। লৌহ ও পারদ থেকে প্রস্তুত

ওষুধগুলি রোগনাশক এবং আয়ুবৃদ্ধিকর রূপে পরিচিত হওয়ায় এইগুলি 'রসায়ন' নামে পরিচিত হয়।

প্রথমে লোহের কথা ধরা যেতে পারে। লোহ নিষ্কাশন ও ব্যবহার বিধি যেমন সেকালে অজ্ঞাত ছিল না তেমনই লোহের প্রধান ধর্মের সংগেও তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। আমাদের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহঘটিত উপাদান থাকা বাঞ্ছনীয় এই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি মানুষের শরীরে লোহার পরিমাণ কম নয়। জারণের সহায়ক নানা এন্জাইমের অণুতে থাকে লৌহ, শ্বাসকার্যের সহায়ক সবগুলি রঞ্জক পদার্থের অণুতে থাকে লৌহ, আবার রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যেও থাকে লৌহ। খাদ্যে লোহার অভাব ঘটলে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকার উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে রক্তাল্পতা রোগ জন্মায়। সেইজন্য দুর্বল রোগীকে যে ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাতে লৌহঘটিত উপাদান অবশ্যই থাকে। প্রাচীনকালেও শরীরে লোহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন চিকিৎসকগণ। তাই লৌহ-ভস্ম ও লৌহঘটিত খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে পারদের ব্যবহার দেখে মনে হয়, ভারতই প্রথম পারদ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। হিঙ্গুল-নামক পারদ-গন্ধকের যৌগ থেকে পারদ নিষ্কাশিত হত। পারদের আকরিক খুব কম দেশে আছে। প্রাচীন ভারতে গান্ধার দেশে (আফগানিস্তান) পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে হিঙ্গুল পাওয়া যেত (এখনও পাওয়া যায়)। ভারতীয় রসায়নবিদ্গণ তাদের সংগ্রহ করে পারদভস্ম, মকরধ্বজ, রসকর্পূর, পারদ-গন্ধকের কজ্জলী, রসপর্পটি প্রভৃতি প্রস্তুত করে ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে প্রায় আঠার রকমের পারদ যৌগ প্রস্তুতির বিধি আছে।

পারদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৮০, অর্থাৎ পারদ পরমাণুর কেন্দ্রকে ৮০টি প্রোটন আছে। সোনার পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা ৭৯। পর্যায় সারণীতে স্বর্ণের পরেই পারদের স্থান। পারদ-পরমাণু থেকে মাত্র একটা প্রোটন বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারলে পারদের পরমাণু সোনাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। প্রাচীন ভারত এমন তথ্যের সন্ধান পেয়েছিল কিনা জানা যায় না, তবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা একমাত্র পারদ থেকে সোনা প্রস্তুত করার

চেষ্টা করে গেছেন। ধাতুর মধ্যে একমাত্র পারদ থেকেই সহজে সোনা প্রস্তুত করা যেতে পারে কেমন করে যেন তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন। আজ পারমাণবিক যুগেও সে চেষ্টা অব্যাহত আছে।

পারদের পর চিকিৎসকগণ যে ধাতুটির ব্যবহার করেন সেটির নাম আর্সেনিক। নাগার্জুনই সেঁকোবিষ বা আর্সেনিককে প্রথম ওষুধরূপে ব্যবহার করেছিলেন। কারও কারও মতে নাগার্জুনের পূর্বেও সেঁকোবিষের প্রচলন ছিল।

কেবলমাত্র ধাতুবিদ্যা নয়, পরিস্রাবণ, পাতন, উর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও রসায়নবিদ্‌দের পরিচয় ছিল। অ্যালকোহল বা সুরাসার তাঁরা প্রস্তুত করতে পারতেন। কতকগুলো জৈব অ্যাসিড ও জৈবক্ষার তাঁরা উদ্ভিদের ফল পাতা ইত্যাদি থেকে তৈরি করে নিতে পারতেন।

অধাতুর ক্ষেত্রে তাঁরা কোন মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। জল, বায়ু, মাটি এগুলিকে তাঁরা মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। যদিও প্রাচীন কালে কোন দেশ এদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে পারেনি। গন্ধক, ফসফরাস, কার্বন, কয়লার গুণাগুণ ভারত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। গন্ধকের ধোঁয়া জীবাণুনাসক বলে পরিচিত ছিল। কাঠকয়লার বিজারণ ক্ষমতার পরিচয় লাভ করেছিলেন বলে কাঠকয়লার চুল্লীতে লৌহ নিষ্কাশন করতেন।

লৌহশাস্ত্র ও পতঞ্জলি

প্রাচীন ভারত ধাতুশিল্পে যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সে বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে গেছেন। আবার প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত তাদের মধ্যে ধাতুবিদ্যা ছিল অন্যতম। সে যুগে অনেকেই ছিলেন ধাতুবিদ্যাবিশারদ। তাঁদের সবার পরিচয় প্রদান করা আজ আর সম্ভব নয়। কেবলমাত্র দু-একজন যাঁরা কালজয়ী খ্যাতির অধিকারী এবং যাঁদের পুস্তক আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাঁদেরই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

এঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে প্রাচীনকালের ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলার প্রয়োজন। আমরা জানি, সভ্যতার আদি যুগে মানুষ প্রথম যে ধাতুটির পরিচয় লাভ করেছিল—সেটির নাম তামা। একটা যুগকে ঐতিহাসিক-গণ তাই নাম দিয়েছেন তাম্রযুগ। তাঁদের মতে, এই যুগটার স্থিতিকালও বেশ কয়েক হাজার বছর। তাম্রযুগের শেষের দিকে মানুষ আরও কয়েকটি ধাতুর পরিচয় পেয়েছিল। সেগুলির মধ্যে দস্তা, টিন, সোনা প্রধান। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ নামে একটি সংকর ধাতুও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীন সভ্য দেশগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় যে, অতি প্রাচীন-কালে লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ব্রোঞ্জ দিয়ে অলংকার, বাসনপত্র, মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণ করত। সে যুগে ভারতীয়রা ধাতু বিদ্যায় সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তামা, দস্তা, টিন, সোনা, এমনকি পারদের সঙ্গেও তাদের পরিচয় হয়েছিল সেই সুদূর অতীতে। লোহার সন্ধান তারা কবে পেয়েছিল সে কথা সঠিকভাবে জানা না গেলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত লৌহশিল্পে উন্নতি লাভ করেছিল বলে পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতিও অজ্ঞাত, তবে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখানি বই পাওয়া গেছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কিছু কিছু লোহার নমুনাও পাওয়া গেছে। বইখানির নাম লৌহশাস্ত্র, রচয়িতা ভগবান পতঞ্জলি। এই গ্রন্থে

কেবলমাত্র লৌহ নয়, আরও কয়েকটি ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও আছে সংকর ধাতু প্রস্তুতি, ধাতুর বিশুদ্ধিকরণ এবং ধাতব লবণ প্রস্তুতপ্রণালী। সংকর ধাতুর পরিচয় যদিও পতঞ্জলির বহু পূর্বে ভারত জানতে পেরেছিল তথাপি সে যুগের লেখা কোন বই পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু নমুনা আজও দৃষ্ট হয়। এই দিক থেকে পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রই ধাতুবিদ্যার একমাত্র প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

পতঞ্জলির পূর্বে ধাতু নিষ্কাশন এবং সংকর ধাতু নির্মাণ এক শ্রেণীর কারিগরদের জানা ছিল। তারা বংশানুক্রমে এই কাজ করে আসত—লিখে রাখার কোন প্রয়োজন হত না। বৃত্তি ছিল সে যুগে বংশানুক্রমিক। পিতার বৃত্তি পুত্র বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করত। কালক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আসতে থাকে বারবার। তার ফলে সেইসব শিল্পী সম্প্রদায় হারিয়ে গেল চিরতরে। তাদের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল ভারতের প্রাচীন ধাতু শিল্প তথা ভারতের গৌরব। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চারশ বছর আগে থেকে হাজার বছর ধরে বহু মনীষী ধাতু নিষ্কাশনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে-ছিলেন। সেই সব মনীষীদের মধ্যে ভগবান পতঞ্জলির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই বোধ হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি ধারাবাহিকভাবে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মনে হয়, পতঞ্জলির পূর্বেও ধাতুবিদ্যার পুস্তক প্রচলিত ছিল। তা না হলে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেমন করে ধাতুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত? কেবল অধ্যাপকেরা স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করতেন?

পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে পাঁচটি অতি পরিচিত ধাতুর বর্ণনা আছে। ধাতু-গুলি যথাক্রমে লৌহ, তাম্র, টিন, দস্তা ও পারদ। এদের প্রত্যেকটির নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং তৎসহ কয়েকটি সংকর ধাতুর পরিচয়ও স্থান পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ধাতুশিল্পকে করেছে সমৃদ্ধতর। বহু ধাতুর পরিচয় পেয়েছে মানুষ; মানব সভ্যতার অগ্রগতির পিছনে ধাতুর দানও যথেষ্ট। তবে অতি প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির মধ্যে উল্লিখিত কয়েকটি ধাতু এবং অ্যালুমিনিয়ামই প্রধান। অ্যালু-মিনিয়ামের ইতিহাস আবার খুবই সংক্ষিপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই আবিষ্কার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সহজ পদ্ধতি। মাত্র শ-তিনেক বছর আগে অ্যালুমিনিয়াম সম্বন্ধে কোন দেশের জ্ঞান ছিল না। যখন এর পরিচয় পাওয়া গেল তখন হাল্কা ধাতু বলে ধাতু নিষ্কাশনের সনাতন

পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করাও সম্ভব হয়নি। লোহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ভারী ধাতুর বেলায় আজকাল অনেক নতুন নতুন নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও ওদের আকরিককে সুবিধামত ধাতব অক্সাইডরূপে রূপান্তরিত করা হয়। পরে সেই অক্সাইডকে কয়লার দ্বারা বিজারিত করে ধাতুকে নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এই নীতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। যেমন আজকাল লোহা নিষ্কাশনের মূল পদ্ধতিটি হল, প্রথমে লোহার আকরিককে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর সেই পোড়া আকরিকের সঙ্গে কয়লা ও চুন মিশিয়ে মারুতচুল্লীতে প্রচুর তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে লোহা-পাথরগুলো গলে যায় এবং কয়লার দ্বারা ধাতুতে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিটি লোহার অক্সাইড আকরিকের বেলায় প্রযোজ্য। পৃথিবীর প্রায় সব লোহাই অক্সাইড আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়। তামার ক্ষেত্রেও যদি অক্সাইড কিংবা কার্বনেট আকরিক পাওয়া যায় তাহলেও প্রথমে পুড়িয়ে ফেলে তারপর কয়লার দ্বারা বিজারিত করে নিলেই তামা পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় আকরিক খুব কম পাওয়া যায়। তাম্রমাক্ষিক বা কপার পিরাইটিস্ থেকেই এখন বেশীরভাগ তামা নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। তামা আবার মুক্ত অবস্থায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, তামা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বলেই মানুষ প্রস্তর যুগে পাথর খুঁজতে খুঁজতে একদিন তামার সন্ধান পেয়েছিল। পাথরের চেয়ে তামা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, পাথরের পরিবর্তে তামার প্রচলন শুরু হয়েছিল। প্রাচীনকালে তামার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে বেশীর ভাগ মুক্ত তামাকে সেদিনের মানুষ ব্যবহার করে প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে। কিছু কিছু মাত্র তাদের হাত এড়িয়ে ভূগর্ভে অবস্থান করছে।

উপরে বর্ণিত ধাতু নিষ্কাশনের সাধারণ উপায়টি পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে পাওয়া যায়। লৌহ নিষ্কাশনের প্রাচীন পদ্ধতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

ধাতব আকরিককে এক জায়গায় জড় করে কয়লা, কাঠ এবং আরও কতকগুলি জিনিস একত্র মিশিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে গলানো হত। তারপর গলিত লৌহকে কাঠকয়লার তৈরি এক রকম উনানে উত্তপ্ত করা হত। তখন ইস্পাত বলতে কোন কিছু ছিল না। এই উপায়ে নিষ্কাশিত লোহার মান ইস্পাতের চেয়েও উন্নত হত। বিশেষ বিশেষ সময় এর মান এত উন্নত হত যে দীর্ঘকাল ধরে মরচে পড়ত না, নিষ্কাশন পদ্ধতি, কারিগরের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর

নির্ভর করত। কলঙ্কহীন ইস্পাতও সে যুগে তৈরি হত। কুমারগুপ্তের আমলে নির্মিত দিল্লীর লৌহস্তম্ভের গায়ে এখনও মরচে পড়েনি। কোণারকে সূর্যমন্দিরে ব্যবহৃত কড়ি-বরগাগুলো আজও অক্ষত। অথচ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে বিজ্ঞানীরা কলঙ্কহীন স্টেনলেস্) ইস্পাত তৈরি করার জন্য কী পরিশ্রমটাই না করে চলেছেন। তবুও কৃতকার্য হতে পারছেন না। ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে লোহার সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে মরচেহীন ধাতু-সঙ্কর তৈরি করছেন। সেযুগে ক্রোমিয়াম কিংবা নিকেল আবিষ্কৃত হয়নি। আবার আবিষ্কৃত হয়নি তড়িৎ এবং তার গুণাবলী। কেবলমাত্র লোহা থেকে কলঙ্কহীন ইস্পাত—আজকের দিনেও বিস্ময় উদ্রেক করে। শোনা যায়, গুপ্ত-যুগের অনেক আগে ভারতীয় কারিগররা কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ভারতে প্রস্তুত লোহার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। মহাবীর আলেকজান্দার ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন এমন নজির আছে। সেযুগের উন্নত জাতের ইস্পাতপ্রস্তুতপ্রণালী আজ সম্পূর্ণরূপে জানা না গেলেও পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, লোহা-পাথরকে পুড়িয়ে লোহা নিষ্কাশন করে নেওয়ার পর কাঠকয়লার চুল্লীতে পুনরায় পোড়ান হত। কাঠকয়লার চুল্লী অবশ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কয়লা উত্তম বিজারক। ধাতব অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পরিণত করতে হলে কয়লা ছাড়া উপায় নেই। আধুনিক ইস্পাত তৈরির জন্য যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে বিসিমার পদ্ধতি ও সিমেন্স মার্টিন পদ্ধতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইস্পাতের তৈরি কাঠামোর ভেতরে একটা প্রলেপ অবশ্য দেওয়া থাকে। আকরিকের মধ্যে ফস-ফরাসের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুযায়ী দু-ধরনের প্রলেপের ব্যবস্থা আছে। হয় আম্লিক প্রলেপ, নয়তো ক্ষারীয় প্রলেপ। পতঞ্জলি-বর্ণিত চুল্লীতে কোন প্রলেপ কিংবা চুল্লীর কাঠামো সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। বর্ণিত হয়েছে, চুল্লীটি কেবলমাত্র কাঠ-কয়লা দিয়ে নির্মিত। বর্তমানেও দেখি, ইস্পাত তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে একরকমের মিশ্রণ যোগ করা হয়, তাতে অবশ্য কয়লা থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত কবে যে লোহা এবং পাথরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ভারতের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় লোহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। পন্ডিতেরা অনুমান করেন মেসোপটেমিয়া ও

এশিয়া মাইনর সর্বপ্রথম লোহার পরিচয় পায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ানরাই লৌহ নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতেই লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি আর্মেনিয়ানদের কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। হয়তো এই সময় ভারতও লোহার কথা জানতে পারে এবং অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান হিসাবে লোহাকে ব্যবহার করে।

পণ্ডিতদের এই অনুমান কতখানি সত্য ঠিক করে বলা যায় না। অনেকে আবার বলেন, বহিরাগত আর্যগণ লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাঁরা ভারতে আগমন করেছিলেন খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে। অপরপক্ষে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে যদি আর্মেনিয়ানরা লৌহ নিষ্কাশনে সমর্থ হয়েছিলেন তাহলে মাত্র একশ বছরের মধ্যে ভারত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে এমন উন্নত লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলল যা আলেকজান্দার এবং তাঁর অভিজ্ঞ সেনাপতিরা দেখে অবাক হয়েছিলেন?

আমরা যদি বলি ভারতই লৌহ আবিষ্কার করেছিল তাহলে বিদেশীরা ক্ষুণ্ন হবেন এবং চারদিক থেকে তর্কের ঝড় উঠবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন—ভগবান বুদ্ধেরই তো আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। তাঁর সমসাময়িক যে সমস্ত পরাক্রান্ত রাজার পরিচয় পাই তাঁরা কি যুদ্ধে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন না? সেই সব রাজবংশ কি গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে কয়েক-শ বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেন নি? মনের কোণে অনেক প্রশ্নই উঁকি মারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে। ভাবতে ইচ্ছে হয় ভারত থেকেই এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বাইরে। হয়তো আর্যরাও বহিরাগত নন— অতি প্রাচীনকালে ভারত থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন নানাদেশে। গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার মিল দেখে আমরা বলি আদি ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন হয়েছিল এই সব ভাষা। সেই আদি ভাষা-গোষ্ঠীর জন্মস্থান রুশ দেশে না হয়ে ভারতে উৎপন্নও তো হতে পারে! এ প্রশ্নের জবাব হয়তো একদিন পাওয়া যেতে পারে।

যাইহোক, ইতিহাস থেকে যা জানা যায় তা হল ভারতে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত যে সব লোহার নমুনা এখন পাওয়া যায়, গবেষকগণ অনুমান করেছেন সেগুলির কোনটিই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে নয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী থেকেই লোহার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সেই সময় ভারতে

আবিষ্কৃত হয় উন্নত লৌহনিষ্কাশন প্রণালী। তবে একথা সত্য যে আজকের মতো এত প্রচুর লৌহ নিষ্কাশন তখন সম্ভব হত না। এক একটি চুল্লীর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র দশ-বিশ কিলোগ্রামের মত।

লৌহশাস্ত্র রচয়িতা পতঞ্জলি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদির বেশ কয়েকটিতে পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায়। আবার পতঞ্জলি নামের সঙ্গে যে সব শাস্ত্রের নাম যুক্ত সেগুলিও এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম ও প্রধান পুস্তক পাণিনির মহাভাষ্য। এই পুস্তকখানিতে পতঞ্জলি যে সাহিত্য ও ব্যাকরণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পুস্তক যোগদর্শন ভারতের সর্বকালের একখানি শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। যোগদর্শন রচয়িতা পতঞ্জলিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয় গ্রন্থ বহু প্রাচীন ও নবীন গবেষকদের মতে চরক সংহিতা। চরক সংহিতার মত দ্বিতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীতে কোনদিন রচিত হবে কিনা সন্দেহ। হাজার হাজার বছর পরেও যোগদর্শন ও চরক সংহিতার মূল্য এতটুকু হ্রাস পায়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। চতুর্থ গ্রন্থ লৌহশাস্ত্র লেখকের অসাধারণ রসায়ন জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এখন প্রশ্ন, বৈয়াকরনিক, দার্শনিক, শরীর-বিজ্ঞানী ও রসায়ন-বিজ্ঞানী পতঞ্জলি কি একই ব্যক্তি?

ইতিহাসে একাধিক আর্যভট্ট, ভাস্কর, নাগার্জুন এবং চরকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পতঞ্জলি ইতিহাস স্বীকার করে না। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পতঞ্জলি ভারতের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে ব্যাস, বাল্মীকি, পতঞ্জলি, নাগার্জুন, বুদ্ধ, শঙ্কর, কালিদাস, অশ্বঘোষ আর্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্যকে বোঝায়। এমন মহাজ্ঞানী ও প্রতিভাধর দেবভূমি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের জন্মদান করে জন্মভূমিই হয়েছে কৃতার্থ।

বিভিন্ন শাস্ত্র পতঞ্জলিকে বলেছেন গোণিকাপুত্র। শব্দকল্পদ্রুমের মতে তিনি গোণর্দীয়। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা নামক একটি স্থান। জন্মকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। পতঞ্জলি সম্বন্ধে আরও একটি মত প্রচলিত। অনেকে তাঁকে অনন্তনাগের

অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে দুঃখ-কষ্ট দূর করতে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে একবার অনন্তনাগ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধরাধামে। তিনিই ভগবান পতঞ্জলি। এই মতের যাঁরা সমর্থক, তাঁরা পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্যটিকে "ফণিভাষ্য" নামে অভিহিত করেন।

পতঞ্জলি কোথায় এবং কিভাবে শিক্ষালাভ করেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তাঁর সময় ভারতে ছিল একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন। তক্ষশীলা তার নাম। পাণিনি এবং মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ও কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৌটিল্য তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। তক্ষশীলা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। পতঞ্জলির সময়ও ঐ শিক্ষায়তনটির প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পতঞ্জলি হয়ত তক্ষশীলারই ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় উত্তর ভারতে বিরাজ করছিল চরম অরাজকতা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মৌর্য যুগের অবসান। তাঁরই আমলে মৌর্যবংশের শেষসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন। শোনা যায়, পুষ্যমিত্রও ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। মৌর্য-বংশের শেষ বংশধরকে বধ করলেও রাজ্যের অতি অল্প অংশই নিজের অধিকারে এনেছিলেন। বিদিশা, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্যগুলি তাঁকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। পুষ্যমিত্র পরে এই রাজ্যগুলিকে নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। আরও কিছু পরে পুষ্যমিত্রপৌত্র বসুমিত্র বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকদের প্রতিহত করেছিলেন। এই দুই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই সময় দেশ বৌদ্ধধর্মের বন্যায় উত্তাল—ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিঃশেষিতপ্রায়। কোনো ঋত্বিক্ খুঁজে পাননি পুষ্যমিত্র। শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর পেয়েছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ পতঞ্জলিকে। পতঞ্জলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরম প্রীতিলাভ করেছিলেন পুষ্যমিত্র। পতঞ্জলি সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঋত্বিকের ভার গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পুষ্যমিত্র তাঁকে মহাসমাদরে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন।

পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও কোনোরকম ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না তাঁর মধ্যে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি কোনদিন বিদ্বেষ পোষণ করেননি।

পরন্তু তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁরই প্ররোচনা ও প্রচেষ্টায় পুষ্যমিত্র সুপ্রসিদ্ধ ভারহুত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপের দ্বারদেশে স্তূপগুলিকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এক সুদৃশ্য লৌহ-প্রাচীর। পুষ্যমিত্রকেও অনেকে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী বলে মনে করে থাকেন। একথা অবশ্য সত্য নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর যদি বিদ্বেষ থাকত তাহলে ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে যত্নবান হতেন না। আজও তাঁর সে কীর্তি বৌদ্ধশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে পরিগণিত।

মোটকথা পতঞ্জলি কোন ধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষকে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসাই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম। এই দিক থেকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত মিল। ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাঁকে কোনদিন বিভ্রান্ত করে নি। মানুষের জন্য তিনি এত বেশী ভাবনা ভেবেছেন যে এমনটি পৃথিবীতে আর কেউ ভেবেছেন কিনা সন্দেহ। কোন ধর্মপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে মানুষের ত্রুটি নিরাময়। তাঁর ধারণা ছিল মানুষের দোষ ত্রিবিধ। বাক্যের দোষ, মনের দোষ এবং শরীরের দোষ। বাক্যের দোষ দূর করতে তিনি রচনা করেছিলেন পাণিনির মহাভাষ্য, মনের দোষ নিবারণের জন্য যোগদর্শন বা পাতঞ্জলদর্শন এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরক সংহিতা। এই তিনখানি পুস্তকই ভারতের তিনখানি অমূল্য রত্ন। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে এমন পুস্তক ক'খানা আছে। অথচ তাঁর মহান উদ্দেশ্য আমরা আজও সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। তাই পতঞ্জলির মত অবতারকল্প মহাপুরুষ আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত। একটি মহান জাতির পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে?

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জলি দেহরক্ষা করেন।

নাগার্জুন

প্রাচীন ভারতে আরও একজন রসায়নবিদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম নাগার্জুন। তিনি নাকি পারদ ও গন্ধক-ঘটিত ওষুধ প্রথম ব্যবহার করে-ছিলেন এমন একটা প্রসিদ্ধি আছে। তিনি আর্সেনিকেরও ব্যবহার জানতেন। চোলাইকরণ, পাতন প্রভৃতি পদ্ধতিগুলিও তাঁর অজানা ছিল না। প্রাচীন ভারতের রসায়ন সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই নাগার্জুন সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। একমাত্র তাঁর লেখা বই থেকেই সেযুগের রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সবাই একটা অনুমান খাড়া করে থাকি। প্রাচীন আয়ু-র্বেদ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের রসায়নাচার্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্যন্ত সবাই নাগার্জুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু এই নাগার্জুন যে কে ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আবার নাগার্জুন এই নামটিকে ঘিরে ভারতে কিংবদন্তীরও অভাব নেই। বিভিন্ন প্রমাণ থেকে ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নাগার্জুন নামে অন্ততঃ চারজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বর্তমান ছিলেন। একজন মহাদার্শনিক বৌদ্ধ নাগার্জুন, একজন তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতা নাগার্জুন, আর একজন চিকিৎসাশাস্ত্রকার নাগার্জুন এবং শেষজন রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ নাগার্জুন।

কয়েকজন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের টীকাকার এবং সুশ্রুত সংহিতার সংস্কারক রূপে নাগার্জুনের নাম উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলি যেমন অগ্নিবেশ সংহিতাকে সংস্কার করে চরক সংহিতা রচনা করেন ঠিক সেইভাবে সুশ্রুত সংহিতাখানিকে সংস্কার করেছিলেন নাগার্জুন। যে সুশ্রুত সংহিতার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানি ছিল নাগার্জুনের হাতে নতুন কলেবরে গড়ে ওঠা সুশ্রুত সংহিতা। সেদিক থেকে নাগার্জুনকে পতঞ্জলির মত অসাধারণ চিকিৎসা-শাস্ত্রকার বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেকে এ মত স্বীকার করেন না।

রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ নাগার্জুনকে অনেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে স্থান দিতে চান। তাঁদের মত এই যে, ইনি কক্ষপুটতন্ত্র এবং রসরত্নাকর নামে দুখানি গ্রন্থের প্রণেতা। নেপালের প্রান্তভাগে নাগার্জুনের একটি আশ্রম ছিল। সিদ্ধ

নাগার্জুন নামে ইনি খ্যাত ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জুন যদি সুশ্রুত সংহিতার সংস্কার করতেন তাহলে সংহিতাটিতে পারদঘটিত ওষুধের বর্ণনা থাকত।

তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতা নাগার্জুন জ্যোতির্বিদ্যা এবং জাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জাদুবিদ্যায় তাঁর খ্যাতি বহু দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতা নাগার্জুন সম্বন্ধে অপর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায় না।

দার্শনিক নাগার্জুন সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদিতে নাগার্জুন সম্বন্ধে যেসব সশ্রদ্ধ উক্তি আছে তা থেকে মনে হয় নাগার্জুন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত তারনাথ এবং রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থপ্রণেতা কল্হণের মতে নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক এবং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর ছিল যথেষ্ট যোগাযোগ। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় নাগার্জুন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা "মাধ্যমিকের" প্রতিষ্ঠাতা। কারও কারও মতে নাগার্জুন এককালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ছিলেন।

আচার্য নাগার্জুনের জীবনী চৈনিক ভাষায় রচিত হয়েছিল। ঐ জীবনী গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য নয়। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাগার্জুন ছিলেন বিদর্ভ নগরীর অধিবাসী। এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। যৌবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে ভগবান তথাগতের বাণীকে দেশ-বিদেশে প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে, নাগার্জুনের প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। অন্ধ্রের রাজা সাতবাহন তাঁর কাছে বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় প্রত্নকীর্তিসমৃদ্ধ যে "নাগার্জুন কোণ্ডা" উপত্যকাটি আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেকের মতে এই স্থানটির নামকরণ হয়েছিল বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের নামে। কণিষ্কের আমলে যে চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের আহ্বান করা হয়েছিল তাতেও ছিল নাগার্জুনের

প্রত্যক্ষ যোগ। এই নাগার্জুন চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর মাধ্যমিক দর্শনের জন্য।

এখন প্রশ্ন হল নাগার্জুন একজন না একাধিক? আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচয়িতা নাগার্জুনের অস্তিত্ব অনেকে বিশ্বাস করেন না। তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতা এবং রসরত্নাকর রচয়িতা নাগার্জুন একব্যক্তি হতে পারেন। কিন্তু বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন কি পৃথক ব্যক্তি?

ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করতে না চাইলেও নাগার্জুন যে একজন ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করার কারণ আছে। প্রাচীনকালে যে সব মহামনীষীর সন্ধান আমরা পাই, তাঁরা কেউ একটিমাত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সব বিষয়েই তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। এক একজন দু-তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নাগার্জুনের মত এতবড় প্রতিভাধরের পক্ষে একাধিক বিষয়ে একাধিক শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনা করা অসম্ভব নয়। নাগার্জুন চিরকাল ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন।

পরিশিষ্ট

হিন্দুধর্ম ও বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারত জড়বস্তুকে নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করেনি। ঈশ্বর ও আত্মাকে জানার জন্য যতটুকু পার্থিব বস্তুকে জানার প্রয়োজন হত কেবল সেই-টুকুই ছিল আলোচ্য বিষয়। সেকালে আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজনীতি ও ধর্মনীতির ছিল প্রত্যক্ষ যোগ। মানবকল্যাণে নিয়োগ ছাড়া কদাচ বিজ্ঞানকে কোন অপকর্মে ব্যবহার করা হত না। আসল কথা সেদিন সমাজের স্বার্থে নিযুক্ত হয়েছিল বিজ্ঞান। তাই দেখা যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও গণিতের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশী করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, মানুষকে সুস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং দৈনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য গণিত।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন সেকালে বিজ্ঞানকে যদি কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণকর কর্মে নিয়োগ করা হয়েছিল তাহলে শাস্ত্রগুলিতে এত মারণাস্ত্রের উল্লেখ কেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে সেকালে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। মারণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হত সমাজের তথাকথিত অত্যাচারী ও দুর্বিনীত দস্যুদের উপর। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ-কৌশলও সবার জানা ছিল না; যাঁরা দু-চারজন জানতেন তাঁরা যোগ্য পাত্র ছাড়া অযোগ্যকে কখনই নির্মাণ কিংবা প্রয়োগ কৌশল শেখাতেন না। এমনও দেখা গেছে অস্ত্রের যাতে অপ-ব্যবহার না হয় তার জন্য গ্রহীতাকে গুরুদেব বার বার পরীক্ষা করেছেন। সমাজের দুর্যোধনরা কিছুতেই ভাল অস্ত্রলাভ করতে পারতেন না; শ্রীরামচন্দ্র কিংবা অর্জুনের মত ধীর, স্থির, আদর্শবান চরিত্রবান এবং মানবহিতৈষীরাই উপযুক্ত বিবেচিত হতেন। যথাসময়ে তাঁরা ঐ অস্ত্র দ্বারা সমাজের বলশালী শত্রুকে নিধন করে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত করতেন।

মানব সভ্যতার আদি যুগেও আমরা দেখি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল। সে প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ বাঁচার এবং শত্রুর কবল

থেকে আত্মরক্ষা করার। একদিন মানুষ পাথর ছুঁড়ে জন্তু-জানোয়ার তাড়াত কিংবা পশু শিকার করত। বড় পাথরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করত, পাথরে পাথর ঘষে ধারাল করত। একদিন আকস্মিকভাবে সে সন্ধান পেয়েছিল আগুনের। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বিজ্ঞানের দ্বার মুক্ত হয়েছিল সেইদিনই। আগুনকে ক্রীতদাসে পরিণত করে অরণ্যচারী বর্বর মানুষ বাসা নিল পাহাড়ের গুহায়। কাঁচা মাংস আর খেল না; পুড়িয়ে নিল আগুনে। আরও একদিন আগুনের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলল মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্প। তারই পরোক্ষ ফল হল কৃষিকাজ। একদিকে অর্জন করল খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা, অপরদিকে জীবনের নিরাপত্তা। এতদিনে মুখ ফেরাল অবগুণ্ঠনবতী প্রকৃতির দিকে। দেখতে লাগল তার চারপাশের কত বিস্ময়কর জিনিসকে। এই পৃথিবী, তার গাছপালা, জীবজন্তু, অরণ্য, কন্দর, নদী, সাগর। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত অনন্ত মহাকাশ। সেখান থেকে দিবা রাত্রি কিরণ দিচ্ছে সূর্য এবং চন্দ্র। বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রূপরাশি পাগল করে তুলল মানুষকে। অজানাকে জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নিল সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম। আজকের মত সেদিনের মানুষও প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে খুঁজত কার্যকারণ সম্পর্ক। বিজ্ঞানের অভাবে সেদিন তারা সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়নি। তাইতো ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল অন্ধবিশ্বাস, ধারণা ও সংস্কার। সেই বিশ্বাস এবং সংস্কার থেকে জন্ম নিল ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস। পরবর্তীকালে এই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর এক একটি আদিম সভ্যতা। তখন বিজ্ঞানচর্চা হয়ে উঠল ধর্মের একটা বিশেষ অঙ্গ।

ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বরং বিজ্ঞান ও ধর্মকে পাশাপাশি রেখে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে—সব দেশকে ছাড়িয়ে। অপরিমিত শক্তির অধিকারী হয়েও ভারত সেদিন দম্ভ প্রকাশ করেনি ধর্মহানির ভয়ে। কোথাও যদি ক্ষতিকর কিছু আবিষ্কৃত হল তাকে ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত করে তার প্রয়োগ করল ব্যাহত। ধর্মহানি ও আত্মাভিমানের ভয়ে সেদিনের বিজ্ঞানীরা নিজেদের নাম পর্যন্ত গোপন রাখতেন। সেকালে ভারতের সমাজও ছিল সমষ্টির স্বার্থের জন্য, একক স্বার্থের জন্য নয়। সমাজের উন্নতি ছিল মানুষের একমাত্র ধর্ম। ধর্মে এবং ঈশ্বরে এমন অখণ্ড বিশ্বাস ছিল বলেই তাঁরা এমন মহান আদর্শের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ যাঁরা বিজ্ঞানকে হাতে পেয়ে

লোভের বশবর্তী হয়ে খুঁজতে বেরিয়ে ছিলেন পরশমণি এবং মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাঁদেরও ছিল ধর্মে ভয় ও ঈশ্বরে বিশ্বাস।

আধুনিক বিজ্ঞান ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূলে করেছে নিদারুণ আঘাত। কিছু কিছু ধর্মীয় কুসংস্কার, কুপ্রথা প্রভৃতি দূর করে মানব সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও করেছে অনেকটা শিথিল। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীনকালের বিজ্ঞান এ যুগের বিজ্ঞানের মত এত উন্নত ছিল না, মাত্র দেড়শ বছরের বিজ্ঞানের দানের কাছে হাজার হাজার বছরের আবিষ্কার অতি নগণ্য। আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই চলেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কয়েক বছরের ইতিহাসে মানুষ আবিষ্কার করেছে কত শত বিস্ময়কর জিনিস, স্থলভাগে বাষ্পচালিত, তৈলচালিত ও বিদ্যুৎ-চালিত ইঞ্জিন, সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোত, আকাশে বিমান, বিদ্যুতের কল্যাণধর্ম, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্তা, চলচ্চিত্র, প্লাস্টিক, তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ, অসংখ্য যন্ত্রপাতি, অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ যা মানুষের জীবনের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে বসেছে, অপরদিকে প্রচন্ড বিস্ফোরক পদার্থ, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে, এক দারুণ আশঙ্কা। আজ কৃত্রিম উপগ্রহে চেপে গ্রহে গ্রহে হানা দিচ্ছে মানুষ, লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত জিনিসকে ঘরের মধ্যে বসে প্রত্যক্ষ করছে, শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমানে আরোহণ করে মুহূর্তে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসছে। আবিষ্কার করেছে রেডার যন্ত্র, লেসার রশ্মি, বুদ্ধি ও বোধিযন্ত্র। উদ্ঘাটন করেছে জীবনের রহস্য, পরিচয় পেয়েছে পদার্থের আসল স্বরূপ, উন্মোচিত হয়েছে বিশ্বের খবর। এককালে যা ছিল স্বপ্ন কিংবা রূপকথার গল্পের মত অবাস্তব আজ তাকে সত্যে পরিণত করেছে। একদিকে মানুষ স্বপ্ন দেখছে, গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করবে প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষের, গ্রহে গ্রহে স্থাপন করবে উপনিবেশ, রোগ শোক জরা ব্যাধিকে করবে নির্মূল, মর্ত্যে সৃষ্টি করবে একটা নতুন স্বর্গ; অপরদিকে দেখছে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমার বিশ্বধ্বংসীরূপ, বোমাবর্ষী শক্তিশালী রকেট, সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত সাবমেরিন—আরও কত বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর দান! মাত্র দেড়শ বছরে মানব সভ্যতা যদি এই পরিমাণ এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আগামী দেড়শ বছরে মানব সভ্যতা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? পৃথিবীর বুকে সত্য সত্যই কী নেমে আসবে স্বর্গ, না একটা বিরাট নরককুণ্ড?

ইতিমধ্যে এই সব অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের মাধ্যমে কিছু দেশ সংগ্রহ করেছে অপরিমেয় অর্থ এবং শক্তি। চারদিকে দেখা যাচ্ছে কেবল প্রভুত্বের লিপ্সা, দেশে দেশে স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও হানাহানি। মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে মানুষ হয়ে পড়েছে স্বার্থপর, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও ক্রূর। অর্থশালী শক্তিশালী যারা, তারা অত্যাচার অনাচার হত্যা নিষ্ঠুরতায় ভরিয়ে তুলছে পৃথিবী। অ্যাটম বোমার আঘাত আজও ভুলতে পারেনি মানুষ। কিন্তু সেই মানুষেরই ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে অ্যাটম বোমার চেয়ে হাজার হাজার গুণে শক্তিশালী মারাত্মক অস্ত্র, যার মাত্র একটি প্রয়োগ হলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সমূহ জীব ও উদ্ভিদ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর পরিণামই বা কী।

একদিন মানুষ হয়ত আশা করেছিল বিজ্ঞান মানুষকে দেবে কেবলমাত্র সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি। তার বদলে এ কী আতঙ্ক। দেবতার শক্তি লাভ করে মানুষ দানবে রূপান্তরিত। বিজ্ঞানের জড়বাদ বিভ্রান্ত করেছে মানুষকে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা একমাত্র জড়বস্তুই বাস্তব ও সৎ। আপন অস্তিত্ব, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, অপরিমেয় অর্থ একমাত্র বাস্তব সত্তা। প্রেম-প্রীতি, অহিংসা, মৈত্রী, ক্ষমা, আধ্যাত্মিকতা সবই অসৎ ও কাল্পনিক।

প্রাচীন ভারতের ধারণা ছিল বর্তমান ধারণার ঠিক বিপরীত। সে মনে করত জড়বস্তুর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই—ওরা অসৎ। শুভবুদ্ধি, প্রজ্ঞা দয়া, প্রেম-প্রীতি, ঈশ্বর-বিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি, এরাই সৎ।

প্রাচীন ভারতের এই মতবাদকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি। আমরা জানি মানুষের উপর তার পরিবেশের সম্পর্ক অতীব নিবিড়। বাহিরের বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের মনোজগতের সম্পর্কও তাই ঘনিষ্ঠ। আবার মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞান গড়ে উঠেছে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা থেকে। আমরা যে বিশ্বজগতের কল্পনা করি তাও আমাদের অভিজ্ঞতার ফল। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তুর সংঘাতের ফলে বা প্রতিক্রিয়ার।

এদিকে পরমাণু বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, অণু পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন অণু পরমাণুর প্রতিক্রিয়ায় কোন একক অণু বা পরমাণুর ধর্মনির্দিষ্ট থাকে না। অণুগুলোর আপন ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে নতুন ধর্মবিশিষ্ট অণুর সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ধর্ম তাই আকস্মিক বা অনিশ্চিত। আকস্মিকতার কারণ,

মূল অণুতে এই ধর্মগুলির কোনটিই বিদ্যমান নেই। তাই বলা যেতে পারে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তুর প্রতিক্রিয়ায় দৃশ্য বস্তুটির ধর্মও অনিশ্চিত বা আকস্মিক।

ইলেক্ট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান নির্ণয়ের পরীক্ষাতে বিজ্ঞানীরা এই অনিশ্চয়তার পরিচয় পেয়েছেন। ইলেক্ট্রনের মধ্যে কখনও প্রকাশ পায় কণিকার ধর্ম, কখনও বা শক্তিতরঙ্গের ধর্ম। এই পরীক্ষাই দূর করে কণিকা বা জড় পদার্থ এবং শক্তির মধ্যে বিভেদ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী নীলবোর কম্পালমেণ্টারী সূত্রটি আবিষ্কার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন ইলেক্ট্রনের উপরোক্ত দুটি রূপ অর্থাৎ জড়ধর্ম ও শক্তিধর্ম পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানবদরদী বিজ্ঞানী বোর এই সূত্রটিকে জ্ঞানতত্ত্বের একটি প্রধান সূত্ররূপে বর্ণনা করেছেন এবং সংস্কৃতিতত্ত্ব, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রয়োগ করেছেন।

আজকের বিজ্ঞানীদেরও তাই ধারণা, নিশ্চিত ও অনিশ্চিত যে দুটি বিধান আমরা প্রত্যক্ষ করি আসলে সে দুটি পরস্পরবিরোধী নয়। বিরোধ যা দেখি তার মূলে রয়েছে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব। দ্রষ্টার সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর প্রতি-ক্রিয়ার ফলে বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত হয়ে যায়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং তার ভাগ্য এই দুটিকেও আমরা পরস্পর পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। একজন বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে জীবকোষের আর. এন. এ. বা ডি. এন. এ. অণুর অভ্যন্তরে যে সব আকস্মিক পরিব্যাপ্তি ঘটে তাদের মাত্র একটিই অভিব্যক্তির পক্ষে কার্যকর হয়। বাকীগুলো সব অকেজো হয়ে পড়ে। এখানেও সেই আকস্মিকতার প্রভাব। বহুর মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় একটির সৃষ্টি। কিন্তু অপরগুলি অনাসৃষ্টি বলা যাবে না। তাই সৃষ্টি ও অনাসৃষ্টি পরস্পরের পরিপূরক। আরও প্রমাণিত হয় একের সঙ্গে বহুর যে বিরোধ তাও পরস্পরের পরিপূরক।

এমনই সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বিশ্বপ্রকৃতিতে জড় ও শক্তি একমাত্র বাস্তব সত্তা নয়। শুভবুদ্ধি, আদর্শ প্রভৃতিও বাস্তব সত্তা। বহির্জগতের তামসিক ও রাজসিক সত্তার পরিপূরক আরও একটি সত্তা আছে যার নাম সাত্ত্বিক সত্তা। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিচ্ছেদ নেই, বরং পরস্পর পরস্পরের উপর

নির্ভরশীল। যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানী তাঁরা এই সত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। বর্তমান কালের এক শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী জলদগম্ভীর স্বরে একদিন ঘোষণা করেছিলেন—Science without religion is lame and religion without science is blind.

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিভেদ নেই। ধর্মহীন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানহীন ধর্ম মানুষের শুভবুদ্ধিকে করে আচ্ছন্ন। সুখের কথা, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই একথা বুঝতে পেরেছেন, তাই পরমাণু বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে হয়ত এক নবযুগের সূচনা করবে। বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই যেদিন হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে যাওয়া হচ্ছিল সেদিন 'বোর', 'আইনস্টাইন' প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য বিজ্ঞানীরা দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

এই সত্য এতদিনে পৃথিবীর মানুষ টের পেলেও হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় মহান বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন? বিজ্ঞানের উপরেই স্থান দিয়েছিলেন মানবধর্মকে। বোঝাতে চেয়েছিলেন আমরা যা কিছু করি না কেন, ধর্মকে বাদ দিলে সবই অসৎ ও অবাস্তবে পরিণত হয়। মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিধ্বনি কী আমরা আমাদের বেদ পুরাণগুলিতে শুনতে পাই না?

[অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে]

ললাটলিপি

এক শ্রেণীর জ্যোতিষী আছেন যাঁরা মানুষের ললাটের রেখা এবং হস্তরেখা বিচার করে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। এই বিদ্যা ভারতে অতি প্রাচীন। আমরা অনেক সময় জ্যোতিষীদের কথায় ঠিকমত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। তবুও দেখি বহু সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি নিজের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎটা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠেন এবং জ্যোতিষীর সামনে হাতটা পেতে ধরেন। প্রশ্ন, অনেকের হাতের এবং কপালের রেখায় কি সব সময় ফুটে আছে মানুষের ভাগ্যের ছবিখানা ?

বর্তমানে প্রাণবিজ্ঞানে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সমূহের দিকে তাকালে কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়ত ললাটলিপি পাঠ করতে সমর্থ হন জ্যোতিষীরা।

জীবনবিজ্ঞানের গবেষণাগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন একটি জীব এক কিংবা একাধিক জীবন্ত কোষ সমবায়ে গঠিত। যারা উন্নত জীব তাদের দেহে আছে কোটি কোটি জীবকোষ। জীবের সমূহ কার্যাবলী যথা পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজননক্ষমতা, বংশানুক্রমিতা সবই নির্ধারিত হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত জিন দ্বারা। এই জিন একটি অম্লধর্মী যৌগিক পদার্থ যা জীবকোষে অবস্থান করে। নাম তার ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। মাতৃজঠরে যখন কোন জীবের জন্ম শুরু হয় তখন একটিমাত্র ডিম্বাণু ও একটিমাত্র শুক্রাণুর মিলনে মাত্র একটি কোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। মাতৃজিন ও পিতৃজিনের মিলনকে ডি এন. এ.-র মিলন বলা হয়। এই ডি এন. এ.-ই কালক্রমে এককোষ থেকে বহুকোষ উৎপন্ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবদেহের সৃষ্টি করে এবং নির্ধারণ করে জীবের আকৃতি ও গুণাবলী। ডি. এন. এ.-কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় চার রকমের জৈবক্ষারক—অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, সাইটোসিন ও থাইমিন। যদিও একটি সম্পূর্ণ জীবকোষের মধ্যে আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র জিনিস আছে তবুও ডি. এন. এ-র ভূমিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। জৈবক্ষারক বা বেসগুলো যেভাবে সাজান থাকে

তারই উপর নির্ভর করে কোষটির ভবিষ্যৎ। আবার কোষের যখন বিভাজন হয় অর্থাৎ একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অনুরূপ শিশুকোষে পরিণত হয়, তখন পরবর্তী কোষগুলোর মধ্যে পিতৃকোষের মত ডি. এন. এ. থাকে।

আজ থেকে মাত্র দেড়শ বছর আগে মানুষের ধারণা ছিল, কোন জৈবপদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। জৈববস্তু মাত্রই প্রকৃতিজাত। সর্ব-প্রথম উইলার নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী রাসায়নিক উপায়ে ইউরিয়া প্রস্তুত করে পূর্বোক্ত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ওলোট-পালট করে দেন। তার পরে বিজ্ঞানী বুখনার কোহল তৈরির সময় জীবন্ত বা মৃত ঈস্টের বদলে প্রাণহীন আরক ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফল পেলেন। সেই থেকে জৈবপদার্থগুলো কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। হয়ত অদূরে ভবিষ্যতে একদিন কৃত্রিমভাবে একটি এককোষী প্রাণী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন, পরে বহুকোষী প্রাণীও। বর্তমানে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন ঐ ডি. এন. এ. পর্যন্ত। প্রস্তুত করেছেন ডি. এন. এ. এবং উদ্ধার করেছেন ডি. এন. এ.-র বহু প্রয়োজনীয় তথ্য।

তাঁদের আবিষ্কার থেকে প্রমাণিত হয়েছে ডি. এন এ.-গুলির গঠন ও কার্য-প্রণালী একই। প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে সেই চারটে বেস বা ক্ষারক—অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, সাইটোসিন ও থাইমিন। তবে একজন মানুষ কেন এত চালাক, অপরে বোকা ; একজনের কেন এত প্রতিভা, আর একজন কেন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ? তার জন্য কি কোষগুলির অভ্যন্তরে অবস্থিত ডি. এন এ. দায়ী ?

তাই যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের দেহে আছে অগণিত কোষ। সে কোষগুলি আবার উৎপন্ন হয়েছে একটিমাত্র কোষ থেকে। আদি কোষটির সঙ্গেই তার আপন ভাগ্য জড়িত। কপালের রেখা কিংবা হাতের রেখায় সে বৈশিষ্ট্য কি ধরা পড়বে না ? এমনিতে সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি মানুষের আঙুলের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকটি মানুষের স্বভাবচরিত্রেও আছে যথেষ্ট তারতম্য। সে কি ঐ ডি. এন. এ.-র জন্য দায়ী নয় ? হস্তরেখা তাই অবৈজ্ঞানিক নয়। যিনি নিখুঁতভাবে ধরার প্রণালী বর্ণনা করে গেছেন তিনিও এক ধরনের বৈজ্ঞানিক।
